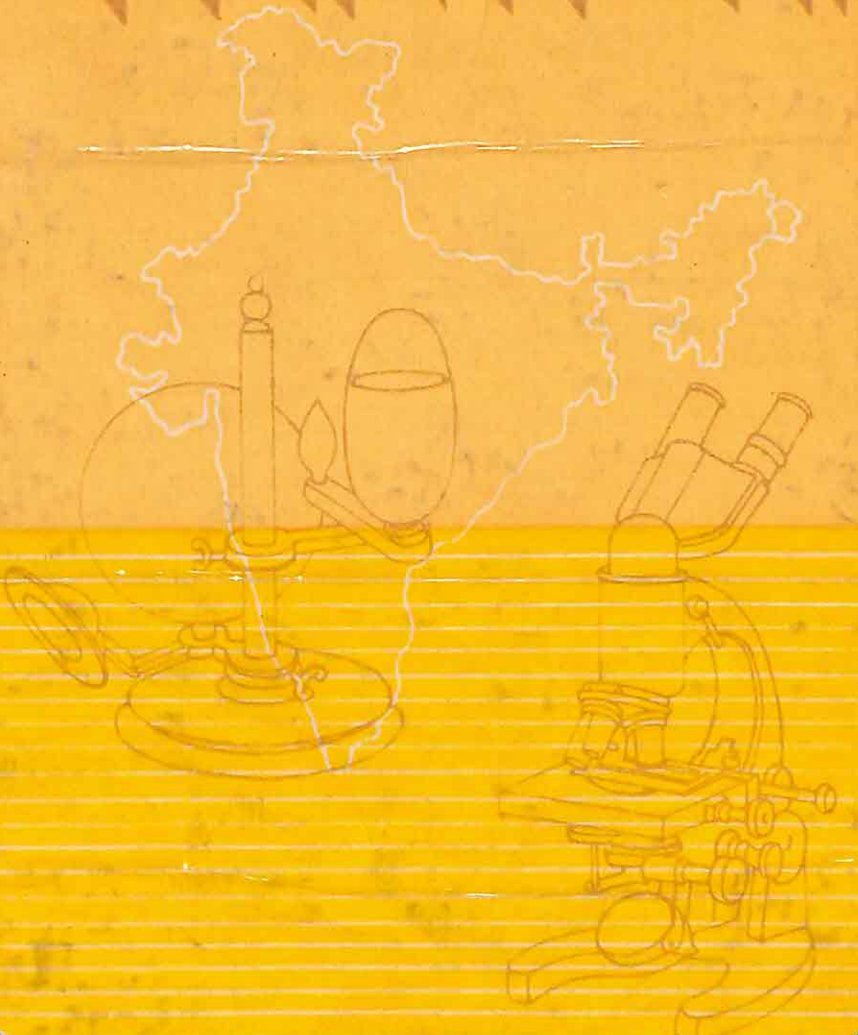
ভারতের
বরণীয় বিজ্ঞানী



CO

ভারতের বরণীয় বিজ্ঞানী

দেবব্রত মল্লিক

মডেল পাবলিশিং হাউস
২এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রকাশক : জয়দেব ঘোষ
মডেল পাবলিশিং হাউস
২এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর, ১৯৮৫

দ্বিতীয় সংস্করণ : মার্চ, ১৯৮৭

তৃতীয় মুদ্রণ : এপ্রিল, ১৯৮৯

অলঙ্করণ : শিবব্রত রায়

প্রচ্ছদ : সত্য চক্রবর্তী

মূল্য : বার টাকা

মুদ্রাকর :
অটোটাইপ
পি-২৫৬এ, সি. আই. টি. স্কিম ৬, মানিকতলা
কলকাতা-৭০০ ০৫৪

য়ুরোপের বিজ্ঞান ইতিহাস রচয়িতারা গ্রীক বিজ্ঞানকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকে এবং কতকাংশে আরব্য বিজ্ঞানকে। অথচ গ্রীকদের দু'হাজার বছর আগে ভারতে, চীনদেশে এবং মধ্যপ্রাচ্যে যে বিজ্ঞান সম্ভার সংগ্রহিত হয়েছিল তার সন্ধান য়ুরোপের জানার কথা নয়, কারণ য়ুরোপ তখন ছিল অজ্ঞানান্ধকারে নিমজ্জিত। গণিতে ও জ্যোতির্বিদ্যায় আর্যভট, বরাহ-মিহির, ভাস্কর, ব্রহ্মগুপ্ত এবং রসায়নে ও চিকিৎসাবিদ্যায় নাগার্জুন, বানভট, চক্রপাণি দত্ত ও শার্ঙ্গধর প্রমুখ বহু সন্ধানী ব্যক্তি স্ব-স্ব ক্ষেত্রে প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছেন।

প্রাচীন ভারতীয়দের গণনাপদ্ধতি সম্বন্ধে প্রচুর তথ্য পাওয়া যায় মহেঞ্জো-দাড়ো ও হরপ্পায় প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান থেকে। বৈদিক যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার সম্পর্কে বৈদিক সাহিত্য থেকে বহুমূল্য তথ্য আহরণ করা গিয়েছে। যেমন—পাটিগণিত, বীজগণিত, সংখ্যা ও গণনা পদ্ধতি, জ্যামিতি, জ্যোতিষ বা নক্ষত্রবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, শল্যবিদ্যা, শারীরস্থান, চরক ও সুশ্রুত-সংহিতা, ত্রিদোষবাদভিত্তিক চিকিৎসা পদ্ধতি ইত্যাদি।

মিশর, ব্যাবিলন, ভারত ও চীনে যেখানে যেখানে নদী-উপত্যকায় নগর সভ্যতার উদ্ভব হয়েছে সেখানেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে। এই সব দেশেই তাই দেখা যায় যে, ক্রমশঃ লিখনপদ্ধতি দশমিক বা ষষ্ঠিক পদ্ধতি অনুসারে গণনা জ্যোতিষ ও চিকিৎসাবিদ্যার ভিত্তি রচিত হয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, হঠাৎ প্রাচীন জাতির সৃজনপ্রতিভা স্তব্ধ হয়ে গেল কেন? পরবর্তীকালের মানবগোষ্ঠী নূতন নূতন ক্ষেত্রে জ্ঞানবিজ্ঞানকে প্রয়োগ করে উন্নতির পথে কেন অগ্রসর হতে পারলনা এই প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া যায় না। বিশেষ করে ব্যাবিলন ও মিশরের জ্ঞানভাণ্ডারে বহু মূল্যবান তথ্যাদি থাকা সত্ত্বেও তার সদ্ব্যবহার হলনা। অথচ গ্রীকরা ঐ সব তথ্যের সম্পূর্ণ সুযোগ নিয়ে এক বিরাট সভ্যতা সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিল।

ভারত ও চীনে এইরূপ জড়ত্ব ছিল না বটে, এবং প্রায় দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত উন্নতির পথে নানা উত্থান-পতন দেখা যায়। কিন্তু তারপরেই হঠাৎ তৎপরতা স্তিমিত হতে থাকে। এরপর থেকেই দেখা যায়, ফলিত বিজ্ঞানের অবনতি এবং সমাজ ব্যবস্থায় শ্রেণীবিভাগ। দেখা গেল বিজ্ঞানের প্রয়োগ দ্বারা উচ্চশ্রেণীর লোকেরা অনায়াসলব্ধ বিলাসের

প্রভাবে যেন ক্রমশঃ সৃজনীশক্তি হারিয়ে ফেলেছে। অন্যদিকে নিওলিথিক যুগে যেসব কৃষক ও কারিগর শ্রেণী আবিষ্কারের মূলে ছিল, তারা অভাবের তাড়নায় সমাজের নিচে পড়ে রইল।

তাছাড়া লিপির ব্যবহারে যোগাযোগ বৃদ্ধি পেল বটে, কিন্তু তা প্রধানতঃ উচ্চশ্রেণীর মধ্যে। এইভাবে জ্ঞানবিজ্ঞান ক্রমশঃ গোষ্ঠীবদ্ধ হতে লাগল। শ্রমিক ও কারিগরদের মধ্যে লিপির পরিচয় না থাকাতে জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকে তারা দূরে সরে গেল। এমনি করে বিজ্ঞানের প্রয়োগ ও প্রসারের ক্ষেত্রে অনতিক্রম্য বাধার সৃষ্টি হল। অনেকের মতে এই কারণে প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞানের গোড়াপত্তন হলেও পরবর্তীকালের সামাজিক বৈষম্য হেতু সম্ভবতঃ অগ্রগতি কয়েক'শ বছর স্তব্ধ হয়েছিল।

ভারতে পাশ্চাত্যবিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যার অনুপ্রবেশ শুরু হয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ থেকে। প্রথমে পর্তুগীজ, পরে ওলন্দাজ, ব্রিটিশ ও ফরাসীরা ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করে। এদের মধ্যে একমাত্র ব্রিটিশ ১৭৫৭ খ্রী. ভারতের উপর প্রভুত্ব বিস্তারে সমর্থ হয়। ব্যবসায় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তারা কিছু-সংখ্যক নিষ্ঠাবান প্রকৃতিবিজ্ঞানী, চিকিৎসাবিদ্, ইঞ্জিনীয়ার, ভূবিজ্ঞানী ও কারিগরশ্রেণীর লোক আমদানি করে এবং কয়েকটি বৈজ্ঞানিক সংস্থা প্রতিষ্ঠার দ্বারা বিজ্ঞানচর্চার সুযোগ সৃষ্টি করে। ক্রমশঃ সাম্রাজ্য বিস্তারের সহায়করূপে উদ্ভিদ ও প্রাণীসম্পদ, খনিজ সম্পদ, ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য এবং আবহাওয়া সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য দরকার হয় কতিপয় সার্ভে সংস্থা প্রতিষ্ঠিত করার। এই সংস্থাগুলির কার্যপরিচালনা করার জন্য যে-সব বৈদেশিক বিজ্ঞানীরা নিযুক্ত হয়েছিল তারা নূতন নূতন আবিষ্কারের সুযোগ পেল। সুযোগ পেল বহু অজানা উদ্ভিদ ও প্রাণী-জগৎ নিয়ে ও খনিজ সম্পদ নিয়ে গবেষণা করার। এদের মধ্যে অনেকেই স্ব-স্ব ক্ষেত্রে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করে। কৃষি তথা ভূমিজাত দ্রব্যাদির উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে এবং নূতন নূতন শস্য, ফল, ফুল ইত্যাদির প্রবর্তনের জন্য ক্রমশঃ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বিস্তার লাভ করে।

ভারতীয়দের মধ্যে বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষাদান বিষয়ে ব্রিটিশ শাসক-শ্রেণী বিশেষ আগ্রহী ছিল না। সাধারণ কাজ চালানর পক্ষে যেটুকু শিক্ষাদান দরকার হত তার বেশী তাদের কাছ থেকে আশা করা যায় নি। কিন্তু রামমোহন রায় থেকে শুরু করে কয়েকজন জাতীয়তাবোধ ও দূরদৃষ্টি-

সম্পন্ন বুদ্ধিজীবী ও স্বাবলম্বনপ্রয়াসী ভারতীয় এগিয়ে এলো ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যমে বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যাকে আয়ত্ত করার জন্য। এই শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে ব্রিটিশ পদ্ধতিতে আরম্ভ হল। পরবর্তীকালেও একই পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। উনিশ শতাব্দীর শেষভাগে বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে যে নবজাগরণ দেখতে পাই তার পুরোভাগে ছিল মহেন্দ্রলাল সরকার, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় জগদীশচন্দ্র বসু ও প্রফুল্লচন্দ্র রায়। মহেন্দ্রলাল প্রতিষ্ঠিত গবেষণাগারের স্বল্পসুযোগ অবলম্বন করে যে কয়জন বিজ্ঞানীর অভ্যুদয় হল তাদের মধ্যে রমন, কৃষ্ণন, রমানাথন, ভগবন্তম, কেদারেশ্বর অন্যতম।

আশুতোষ প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান কলেজে প্রফুল্লচন্দ্রকে কেন্দ্র করে একদল তরুণ বিজ্ঞানী তাদের প্রতিভার পরিচয় দিল। তাদের মধ্যে মেঘনাদ সাহা, সত্যেন বসু, জ্ঞান ঘোষ, জ্ঞান মুখোপাধ্যায়, নীলরতন ধর, দেবেন্দ্রমোহন বসু, শিশির মিত্র, ফণী ঘোষ, নিখিলরঞ্জন সেন, প্রিয়দারঞ্জন রায়, প্রশান্ত মহলানবীশ, বীরেশ গুহের নাম উল্লেখযোগ্য। বাংলার বাইরে ছিল শক্তিস্বরূপ ভাটনগর, জাহাঙ্গীর ভাবা, বিমান দে, প্রফুল্ল গুহ, শেষাদ্রি, আত্মারাম এবং আরও অনেকে। এদের সকলেই সুযোগ-সুবিধার অভাব সত্ত্বেও স্বীয় প্রচেষ্টায় বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে খ্যাতি অর্জন করে। ঐ সময়ে ব্যক্তিগত বদান্যতায় গড়ে ওঠে কিছু গবেষণা সংস্থা। ক্রমশঃ শাসকবর্গও বিজ্ঞানচর্চা ও প্রশিক্ষণকল্পে কয়েকটি সংস্থা স্থাপন করতে বাধ্য হয়। তখন বিজ্ঞান গবেষণার জন্য পরিবেশ অনুকূল হওয়া সত্ত্বেও সুযোগ যথেষ্ট ছিল না।

স্বাধীনতা লাভের পর বিজ্ঞানচর্চার সুবিধা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। ১৯৮১-৮২ সালের হিসাবে দেখা যায় যে, তখন পর্যন্ত নানা ধরনের বারো শ' বিজ্ঞান সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তার মধ্যে অর্ধেকের বেশী বেসরকারী। ঐ বছর সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ ছিল প্রায় একহাজার কোটি টাকা। বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে পর্যাপ্ত সংখ্যায়। একশ' ত্রিশটি বিশ্ববিদ্যালয় ও সমগোত্রীয় শিক্ষায়তন, প্রায় দু'হাজার কলেজ, দেড়শ' ইঞ্জিনীয়ারিং, শতাধিক মেডিক্যাল কলেজ এবং সাড়ে তিনশ' পলিটেকনিকে বছরে প্রায় দেড় লক্ষ লোক বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষা লাভ করছে। বর্তমানে এইরূপ শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা ত্রিশ লক্ষাধিক হবে। জনসংখ্যার অনুপাত (০·৪ শতাংশ) হিসাবে বিজ্ঞান

প্রসারের কাজে আমরা অনেক পিছিয়ে আছি। অতএব বিজ্ঞানীর সংখ্যা বাড়াবার প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে এবং বিজ্ঞানকে লোকায়ত করতে এর প্রয়োজন অনস্বীকার্য।

এই পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীদেবব্রত মল্লিকের বইতে প্রাচীন ও আধুনিক যুগের বিজ্ঞানীদের জীবনকাহিনীর সন্নিবেশ তাৎপর্যপূর্ণ। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের যে কোন ক্ষেত্রেই হোক, তার প্রবাহ চলমান রাখতে হলে সমাজের সর্বস্তরে তাকে ছড়িয়ে দিতে হয়। গোষ্ঠীভুক্ত হলে আর বহুমানতা বজায় রাখা যায় না। অতএব বিজ্ঞান যাতে স্তিমিত না হয়ে পড়ে তার জন্য প্রয়োজন প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে বিজ্ঞানের সঙ্গে সংযোগ সৃষ্টি করা। এই স্তরের পক্ষে নূতন বিদ্যার্থীর বিজ্ঞান শিক্ষায় আগ্রহ বাড়ান যায় যদি তার সঙ্গে বিজ্ঞানীর জীবনীপাঠ যুক্ত করা যায়। বস্তুতঃ যে কোন শিক্ষণীয় বিষয়ের বেলাতেই এই বক্তব্যটি খাটে। আবিষ্কারের সঙ্গে অধিকর্তার সম্পর্ক যে-কোন অনুসন্ধিৎসু মনে অনুপ্রেরণা যোগায়। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র আত্মজীবনীতে বলেছেন যে, বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীর জীবনচরিত তিনি এতবার পড়েছেন যে তাঁর মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। যতবার পড়েছেন ততবারই তিনি কোন না কোন রূপে জ্ঞানান্বেষণের প্রেরণা লাভ করেছেন। এই জীবনীগুলি যদি নিজের দেশের বিজ্ঞানীদের হয়, তাহলে আগ্রহের আরও একটি কারণ থাকে। তরুণ শিক্ষার্থীর মনে জাতীয়তাবোধের সঙ্গে গর্বানুভূতি জাগ্রত হয়ে আগ্রহের আতিশয্য ঘটায়। এরূপ প্রতিক্রিয়া নিশ্চিত সুফলদায়ী।

দেবব্রতবাবু তরুণ বিদ্যার্থীর জন্য ৩০ জন বিজ্ঞানীর জীবনালেখ্য একত্রিত করেছেন। এঁদের মধ্যে কয়েকজন আছেন প্রাচীন ও মধ্যযুগের বিজ্ঞানী। বেশীর ভাগই আধুনিক যুগের। তাঁদের সংখ্যা তুলনায় অধিক। অতএব নির্বাচনের প্রশ্ন রয়েছে। আমার মনে হয়, নির্বাচন বিষয়ে লেখক যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। একজন বিজ্ঞানীর সারা জীবনের কর্ম ও চিন্তাধারা অল্প পরিসরে সহজবোধ্য লেখার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা সহজ-সাধ্য নয়। কিন্তু দেবব্রতবাবু এই কঠিন দায়িত্বও সুচারু রূপে সম্পন্ন করেছেন। তরুণ বিজ্ঞানশিক্ষার্থীর মনে জানার তৃষ্ণা বাড়িয়ে দেওয়ার মধ্যেই বইখানির সার্থকতা।

ডঃ সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়
প্রাক্তন উপাচার্য, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

আমাদের ঐতিহ্য আমাদের গর্ব

মানুষের জীবনে বিজ্ঞানের অনুপ্রবেশ সেই আদিকাল থেকে। সে তার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা অতিক্রম করে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছায়। সাধারণ বুদ্ধি এবং জ্ঞান দিয়ে বুঝতে পারে কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা মন্দ। প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী কখন কি বুনলে ভাল ফল হয়, আবহাওয়া কখন কি রকম থাকে—এইরকম সুসংবদ্ধ চিন্তারই নাম বিজ্ঞান ভাবনা। মানুষ নিজেদের কাজের মধ্য দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন কাজ করতে করতে আয়ত্ত করে কারিগরী কৌশল, এবং পরে এই কৌশল প্রয়োগ করে তাদের কাজ সুসম্পন্ন হয়। তাই বিজ্ঞানের ইতিহাস বস্তুতপক্ষে মানুষের বিবর্তনের ইতিহাসের সঙ্গে অভিন্ন।

গুপ্ত ও উত্তর গুপ্তযুগে হিন্দু ও বৌদ্ধ ভারতের রাজনৈতিক প্রাধান্যের কালে ভারতবর্ষে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করে। ভারতীয় গবেষণায় যেমন বৈদেশিক চিন্তাধারার ছাপ দেখা যায়, তেমনি গ্রীক, চীন ও আরব্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপরও ভারতীয় গবেষণা ও চিন্তাধারার প্রভাব সুস্পষ্ট। চিন্তাধারার এই ধরনের আদান-প্রদান জ্ঞানের অগ্রগতির পক্ষে অপরিহার্য ও স্বাভাবিক।

বৈদিক যুগের পরবর্তী কালে হিন্দু বৈজ্ঞানিকরা আবিষ্কার করেন দশমিক স্থানিক অঙ্কপাতন এবং শূন্যের ব্যবহার। গণিতে শুধু এই দু'টি আবিষ্কারের জন্যই ভারতবর্ষ বিশ্ববিজ্ঞানের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তা ছাড়াও জ্যোতিষ এবং আয়ুর্বেদের যুগের চিকিৎসা-বিজ্ঞানের পদ্ধতি সমস্ত পৃথিবীকে বিস্মিত করে দেয়।

ভারতবর্ষের সেই সব প্রাচীন ঐতিহ্য এবং ধারাবাহিকতা নিয়ে বর্তমান যুগ এগিয়ে চলেছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকলেও ভবিষ্যৎ নিশ্চিত উজ্জ্বল। আমরা সেই দিনগুলোর অপেক্ষা নিয়ে কাল গুনছি।

দেবব্রত মল্লিক

সূচীপত্র

প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞানী

আত্রেয়

ঋষি অত্রির পুত্রের নাম আত্রেয়। জন্ম আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ৬০০ অব্দ। আত্রেয়'র সম্পূর্ণ নাম আত্রেয় পুনর্বসু। তিনি ছিলেন বিখ্যাত তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। বিভাগ চিকিৎসাবিদ্যা। প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ইতিহাসের শুরু বিজ্ঞানী আত্রেয় ও সুশ্রুত এর সময়কাল থেকেই। সুশ্রুত আত্রেয়'র সমসাময়িক।

চিকিৎসা-বিজ্ঞানের জন্মদাতা আত্রেয়'র চিকিৎসা-পদ্ধতি ছিল শল্য-চিকিৎসাবিহীন। অর্থাৎ সাধারণভাবে শরীর চিকিৎসা করাই তাঁর রীতির প্রধান উপায় ছিল। এই বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করার জন্য তিনি যাঁর কাছ থেকে সবচেয়ে বেশি সাহায্য পান তিনি হচ্ছেন শিক্ষা-গুরু ভরদ্বাজ। গুরুর কাছ থেকে শিক্ষালাভ করে আত্রেয় চিকিৎসা-বিজ্ঞানের এক ঐতিহাসিক পুরুষ হয়ে ওঠেন। তিনি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এই বিদ্যা চর্চা এবং এর প্রসার লাভ ঘটিয়েছেন। সেই দিনে এই চিকিৎসাবিজ্ঞানী যত শিষ্য তৈরী করতে সক্ষম হয়েছিলেন সম্ভবত আর কোন বিজ্ঞানীর পক্ষে তা করা সম্ভব হয়নি। আত্রেয়'র ছিল ছয় ছ'জন সুযোগ্য শিষ্য। এঁরা হলেন—অগ্নিবেশ, ভেল, জতুকর্ণ, পরাশর, হারীত ও ক্ষরপানি। হিন্দু চিকিৎসাশাস্ত্রের ইতিহাসে এঁরা প্রত্যেকেই তাঁদের যোগ্যতা দেখিয়ে পারদর্শিতা লাভ করেছেন।

আত্রেয় চিকিৎসাবিদ্যার বহু গ্রন্থ লিখেছেন। তার মধ্যে আত্রেয়-সংহিতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থটি পাঁচ খণ্ডে শেষ হয়েছে। আত্রেয়-সংহিতার প্রধান আলোচ্য বিষয় বিভিন্ন ধরণের রোগ, দ্রব্যগুণ, ভেষজ এবং চিকিৎসা বিধান। সাধারণ মানুষ রোগ ওষুধ এবং নিরাময়—এ সব সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করতে পারে সেদিকে নজর রেখে এই গ্রন্থগুলো রচনা করেন বিজ্ঞানী।

নাগার্জুন

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস খুঁজলে নাগার্জুন নামধারী একের বেশী বিজ্ঞানীর পরিচয় মেলে। অবশ্য প্রত্যেকেই যে যার কাজে খ্যাতিমান; প্রথম জন মাধ্যমিক সূত্রবৃত্তির রচয়িতা শূন্যবাদী বৌদ্ধ নাগার্জুন। তার আবার জন্মের সময় নিয়ে বহুমত আছে। কারো কারো মত খ্রীস্টীয় প্রথম শতক আবার কেউ কেউ বলেন খ্রী. পূ. ৪র্থ শতাব্দীর শেষভাগে। পরে অন্য নাগার্জুনের উল্লেখ করেছেন বৃন্দ তাঁর 'সিদ্ধযোগে'। ইনি সম্ভবত খ্রীস্টীয় চতুর্থ কি পঞ্চম শতকের মানুষ। অনেকেরই ধারণা, সুশ্রুত-সংহিতা নতুন করে সংশোধন করে ইনিই লিখেছেন।

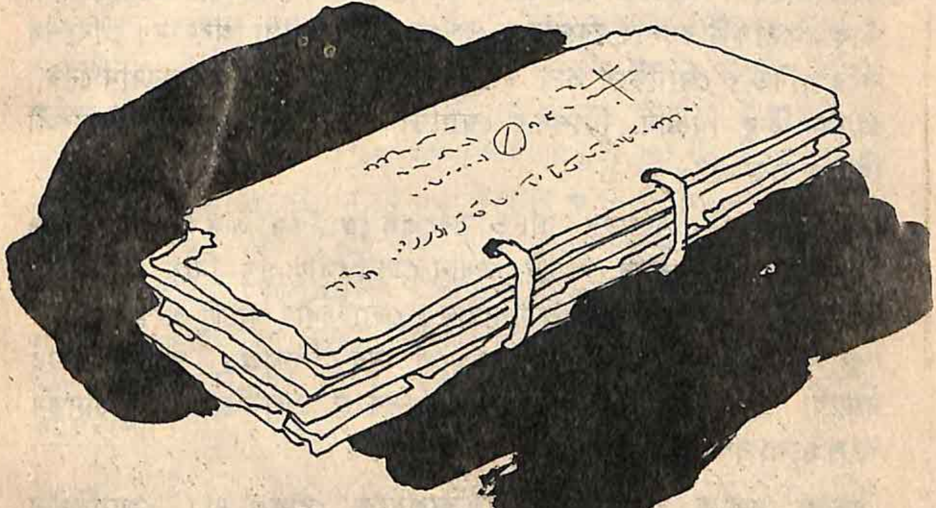
এর পরেও আর একজন নাগার্জুনের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি অষ্টম কি নবম শতকের লোক। ধাতুবিদ্যা, পারদ ঘটিত যৌগিক সম্বন্ধে জ্ঞান ও নানাবিধ রাসায়নিক প্রক্রিয়া সম্বন্ধে অনেক মৌলিক গবেষণার জন্য এই নাগার্জুন প্রাচীন ভারতের এক বিশিষ্ট বিজ্ঞানী। তাঁর গবেষণার ফল রেখে গেছেন লোহাশাস্ত্র, কক্ষপুটতন্ত্র, রসরত্নাকর, আরোগ্য মঞ্জরী প্রভৃতি গ্রন্থে। তাকে বলা হত গুর্জরের রাসায়নিক বা কিমিয়াবিদ নাগার্জুন।

আলবীরুণী কিমিয়াবিদ্ নাগার্জুনের উল্লেখ প্রসঙ্গে লিখেছেন, এই বিদ্যার (কিমিয়ার) একজন বিখ্যাত প্রতিভূ হলেন সোমনাথের নিকটবর্তী দাইহকের অধিবাসী নাগার্জুন। তিনি ছিলেন এই বিদ্যায় একজন পারদর্শী এবং এই বিদ্যায় যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। শুধু তাই-ই নয়। নাগার্জুন তাঁর অধিত বিদ্যাকে লিখে গ্রন্থও রচনা করে ছিলেন। এই নাগার্জুন ছিলেন অষ্টম ও নবম শতাব্দীর মানুষ। ধাতুবিদ্যা পারদঘটিত যৌগিক সম্বন্ধে জ্ঞান ও বিভিন্ন ধরণের রাসায়নিক প্রক্রিয়া নিয়ে বহু মৌলিক গবেষণা করে গেছেন তিনি। প্রাচীন ভারতের

রসায়নে তাঁর বিশিষ্ট অবদানের কথা মানুষ চিরকাল মনে রাখবে।

নাগার্জুন ?

প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞানের ইতিহাসে এই নামটি সত্যি এক অভূতপূর্ব নাম। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন যুগে এক নামধারী মানুষ। ব্যাপারটা বেশ অবাক করে দেয়। এই ভাবনা, এই অবাক করে দেওয়া চিন্তা—সবকিছু নিরসন করে দেয় ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের বক্তব্য। তাঁর-মত ঃ সুশ্রুতের নাগার্জুন, লোহাকনস্ত্রের নাগার্জুন এবং মাধ্যমিক সূত্র-বৃত্তির নাগার্জুন সকলেই সম্ভবত এক ব্যক্তি ছিলেন।



আর্যভট

পাটলিপুত্রের কাছে কুসুমপুরে আর্যভট জন্মগ্রহণ করেন আনুমানিক ৪৭৬ খ্রী.। তাকে বলা হয় প্রাচীনকালের শ্রেষ্ঠ হিন্দু গণিতজ্ঞ জ্যোতির্বিদগণের অন্যতম।

আর্যভটের প্রধান গ্রন্থ আর্যভটীয়। এই গ্রন্থ তিনি রচনা করেন যখন তাঁর বয়স মাত্র ২৩ বছর। গণিতে এবং জ্যোতিষশাস্ত্রে আর্যভটের অবদান অবিস্মরণীয়।

আর্যভটের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'আর্যভটীয়' একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা। সবশুদ্ধ এই গ্রন্থে আছে ১২৫টি শ্লোক। এই শ্লোকগুলো চারটি প্রধান অধ্যায়ে বিভক্ত। যথা : দশগীতিকা। গণিত পাদ। কালক্রিয়া। গোলপাদ।

গণিতপাদে আছে নানা গাণিতিক বিষয়, যেমন—বর্গমূল, ঘনমূল, সমান্তর শ্রেণী, ত্রৈরাশিক, সমীকরণ সমাধান ইত্যাদি। দশগীতিকা কালক্রিয়া ও গোলপাদে আর্যভট জ্যোতির্বিদ্যা সম্বন্ধে নিজের গবেষণা নিয়ে লিখেছেন। হিন্দু জ্যোতির্বিদগণের মধ্যে তিনিই প্রথম পৃথিবীর আহ্নিক গতির কথা উল্লেখ করেন। তিনি নির্ণয় করেন এক মহাযুগে [৪৩২০,০০০ বৎসর] পৃথিবী কতবার আবর্তিত হয়। কিন্তু পরবর্তী কালে কয়েকজন বিজ্ঞানী আর্যভটের এই সিদ্ধান্তকে ভুল বলে প্রমাণিত করেন। তাঁর অশাস্ত্রীয় মতবাদ শিক্ষা দেওয়ার জন্য তাঁকে তীব্র নিন্দা ও সমালোচনা করা হয়েছিল।

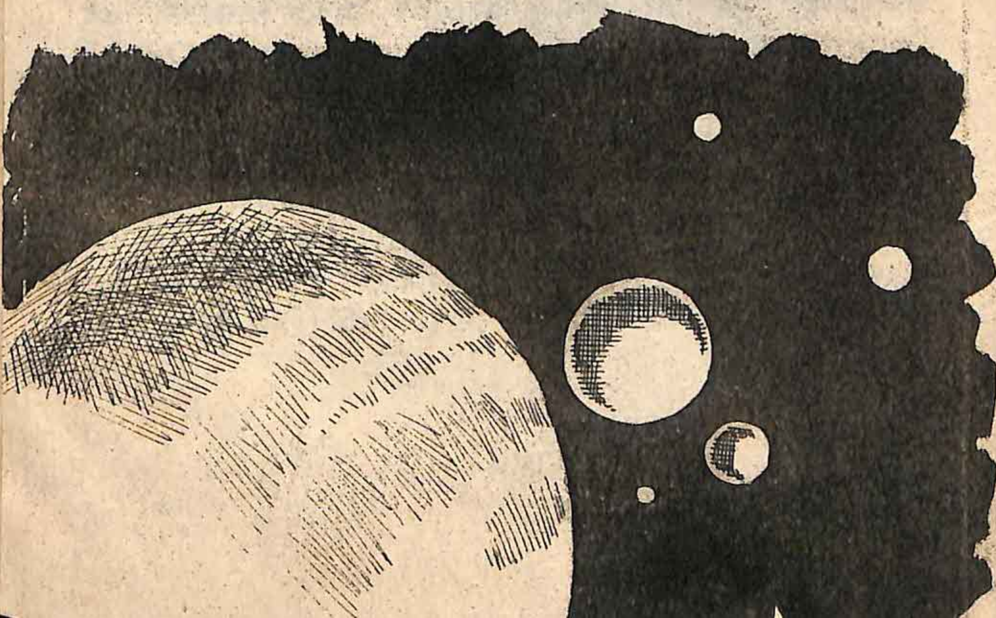
জ্যোতিষ শাস্ত্রে আর্যভট একটি অবিস্মরণীয় নাম। বিজ্ঞানে তাঁর অবদান মানুষ চিরকাল মনে রাখবে। আধুনিক সূর্য সিদ্ধান্তের প্রয়োজনীয় সংশোধন এই বিজ্ঞানীর সময়ই সাধিত হয়। তিনিই প্রথম উৎকেন্দ্রীয় বৃত্তের সাহায্যে গ্রহ গতির ব্যাখ্যা প্রদান করেন। গণনার সাহায্যে গ্রহদের সঠিক অবস্থান নির্ণয় করতে পারার শিক্ষা আর্যভটের কাছ থেকে পাওয়া।

বর্গমূল নির্ণয়ের পদ্ধতি আবিষ্কার করেন আর্যভট। এই পদ্ধতিতে দশমিক স্থানিক অঙ্কপাতন ও শূন্যের ব্যবহার অবলম্বন করা হয়। তিনি তাঁর গণনায় বিভিন্ন জায়গায় স্পষ্টভাবে শূন্যস্থানের উল্লেখ করেছেন।

আর্যভট একজন সূত্রকারও ছিলেন। তিনি শুধুমাত্র গবেষণার ফলগুলো সূত্রের মত করে সংক্ষেপে লিখে রেখে যান। এই সমস্ত লেখাগুলো তিনি লিখতেন সূত্রাকারের নিয়ম অনুযায়ী। তাঁর গবেষণার কার্যাবলী এবং বিস্তারিত বিবরণের কোন হদিস কোথাও পাওয়া যায় না। শুধু জানা যায় একমাত্র শিষ্যদের কাছে মৌখিক অধ্যাপনা করার সময় গবেষণা সম্পর্কে আলোচনা করতেন।

প্রাচীন ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যা এবং গণিতের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে দীর্ঘদিন পর্যন্ত আর্যভটের প্রচণ্ড প্রভাব এবং সশ্রদ্ধ সমাদর ছিল। পরবর্তী কালে এই প্রভাব আরো বেড়ে যায় তাঁর শিষ্যদের গুণে। আর্যভটের শিষ্যরা গুরুর শিক্ষার নানা টীকা, ভাষ্য ও সমালোচনা প্রকাশ করে সাধারণের কাছে জ্যোতিষকে সহজবোধ্য ও জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। যে কজন শিষ্য টীকাকার হিসাবে হিন্দু জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেন তার মধ্যে লাটদেব, প্রথম ভাস্কর ও লল্লর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আরো পরের যুগে আর্যভটের প্রভাব-প্রতিপত্তি ভারতবর্ষের সীমানার বাইরেও বিস্তৃত হয়। মধ্যযুগে মধ্য প্রাচ্যের পণ্ডিতরা যত্নের সঙ্গে আর্যভট-চর্চা শুরু করেন। সেই সময়ের আরবী সাহিত্যে আর্যভটের অনেক উল্লেখ পাওয়া যায়।



বরাহমিহির

আনুমানিক ৫০৫ খ্রী. কিংবা ঐরকম সময়ের কাছাকাছি সময়ে উজ্জয়িনীতে বরাহমিহিরের বিভিন্ন কাজের পরিচয় পাওয়া যায়। অদ্ভুত ধরণের এক জ্ঞানের ভাণ্ডার ছিলেন বরাহমিহির। তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন গণিত, জ্যোতিষ, ফলিত জ্যোতিষ, ভূগোল, মনিকাবিদ্যা এবং প্রাণিবিদ্যায়। এক কথায় বরাহমিহির ছিলেন বিশ্বকোষের মত ব্যাপক। বরাহমিহির বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা নিয়ে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তাঁর প্রত্যেকটি রচনাই বিজ্ঞানের জগতে উল্লেখযোগ্য অবদান। বিশেষ করে গণিত ও জ্যোতিষে তাঁর উল্লেখযোগ্য কোন মৌলিক অবদান নেই। প্রাচীন হিন্দু বিজ্ঞান, বিশেষত জ্যোতির্বিদ্যার ইতিহাসে তাঁর গ্রন্থাবলী বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা' বরাহের রচিত সর্বশ্রেষ্ঠ জ্যোতিষ গ্রন্থ। এই গ্রন্থে তিনি প্রাচীন হিন্দুদের পাঁচটি প্রধান জ্যোতিষীয় গ্রন্থ নিয়ে আলোচনা করেছেন। প্রত্যেকটি রচনাই মূল্যবান। জ্যোতিষীয় পাঁচটি গ্রন্থের নাম—পৌলিশা, রোমক, বশিষ্ঠ, সূর্য ও পৈতামহ সিদ্ধান্ত। বরাহমিহিরের সাহায্য ছাড়া কোনভাবেই হয়তো সিদ্ধান্ত জ্যোতিষের প্রাচীনতম অংশগুলো রক্ষা করা সম্ভব হত না।

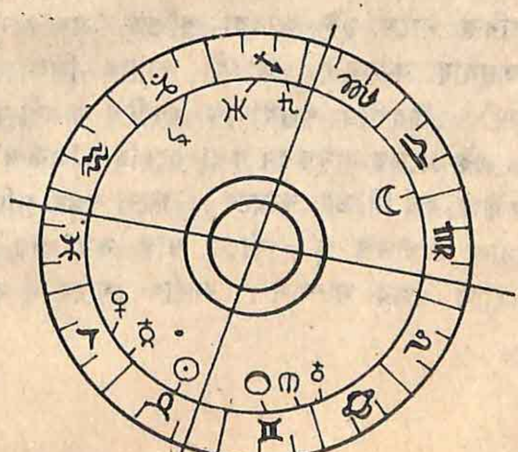
সিদ্ধান্ত বলতে জ্যোতিষীয় গ্রন্থবিশেষকে বোঝায় না। জ্যোতিষীয় উচ্চাঙ্গের যে কোন গ্রন্থকেই হিন্দুরা এই সাধারণ নামে অভিহিত করত। সিদ্ধান্ত শব্দের মানে মীমাংসা। সিদ্ধান্ত ছাড়া হিন্দুদের অন্য এক শ্রেণীর জ্যোতিষীয় গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায়। সেই সব গ্রন্থের নাম তন্ত্র বা করণ। তফাৎ হল তন্ত্র ও করণগুলো সিদ্ধান্তের মত অত উচ্চ পর্যায়ের নয়।

বরাহের পূর্বগামী বহু লব্ধপ্রতিষ্ঠ হিন্দু জ্যোতির্বিদের কার্যকলাপের

উল্লেখ পাওয়া যায় বরাহমিহিরের রচনা থেকে। আর্যভট ও লাটদেব ছাড়াও আরো কয়েকজন প্রখ্যাত জ্যোতির্বিদের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর রচনা থেকে। তাঁরা হলেন সিংহাচার্য, প্রত্নম্ন, বিজয় নন্দী। প্রত্যুম্ন কাজ করেছিলেন মঙ্গল ও শনি গ্রহের গতি নিয়ে। বুধ গ্রহের উপর কাজ করেন বিজয় নন্দী। এঁরা দুজনেই ছিলেন আর্যভটের পূর্বগামী। বরাহমিহির আর্যভট প্রচারিত পৃথিবীর আহ্নিকগতিবাদের বিরোধী ছিলেন। তিনি আর্যভটের এই সিদ্ধান্তকে মেনে নিতে পারেননি।

বরাহের দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'বৃহৎ-সংহিতা'। এই গ্রন্থের প্রধান আলোচ্য বিষয় ফলিত জ্যোতিষ। অর্থাৎ গ্রহের নানা প্রভাব মানুষের উপর এসে পড়ে ; ফলে মানুষ সেই প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্য বিভিন্ন ধরণের পাথর ব্যবহার করে থাকে। বরাহ এইসব পাথরের বাহ্যিক গুণাগুণ সম্বন্ধে বহু মূল্যবান তথ্য বৃহৎ-সংহিতায় লিপিবদ্ধ করেন।

মণি মুক্তা প্রবাল দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান নানা রকমের পাথরের ব্যবহার সুপ্রাচীন। নান ধরণের রঞ্জকদ্রব্য বহুল, উৎপল, চম্পক প্রভৃতি বিভিন্ন ফুলের গন্ধ অনুকরণ করে কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত কয়েকটি সুগন্ধি দ্রব্য, লৌহ প্রভৃতি ধাতু নিষ্কাশন বিদ্যা সম্পর্কে নানা তথ্য বৃহৎ-সংহিতায় পাওয়া যায়। ঐ গ্রন্থে বজ্রলেপ নামে এক ধরনের গুঁড়া বা সিমেন্টের উল্লেখ করেছেন বরাহ। এই গুঁড়ার বাঁধন শক্তি নাকি বজ্রের মত কঠিন। এর ব্যবহারের পরিচয় মেলে প্রাচীন ভারতে ব্যবহৃত মন্দিরাদির নির্মাণকার্যে। এছাড়াও বরাহমিহির রচনা করেছিলেন কয়েকটি ছোট-বড় 'জাতক'। আল্‌বীরুণী বরাহমিহির রচিত একটি জাতক আরবী ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন।



ব্রহ্মগুপ্ত

ব্রহ্মগুপ্তের জন্মগ্রহণের সময় ৫৯৮ খ্রী.। খুব ছোট বয়স থেকেই তাঁর জ্যোতিষীর উপর প্রচণ্ড ঝোঁক ছিল। তিনি দিনের পর দিন সূর্যের ওঠা এবং অস্ত যাওয়ার উপর বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করতেন। গণিত শাস্ত্রের উপর ব্রহ্মগুপ্তের ছিল প্রগাঢ় ভালবাসা।

সেই সময় ভারতবর্ষে জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রধান ক্ষেত্র ছিল উজ্জয়িনী। এক কথায় বলা চলে উজ্জয়িনী ছিল বিজ্ঞানসাধনার তীর্থক্ষেত্র। ব্রহ্মগুপ্তও তাঁর বিজ্ঞানসাধনার স্থান বেছে নিয়েছিলেন এই জায়গায়। 'ব্রহ্ম-স্ফুট-সিদ্ধান্ত' ব্রহ্মগুপ্তের বিখ্যাত গ্রন্থ। এই গ্রন্থটি প্রকাশের সময় বিজ্ঞানীর বয়স হয়েছিল মাত্র ত্রিশ বছর। মূলত পূর্বসিদ্ধান্ত ও আর্যভটের গ্রন্থকে ভিত্তি করেই ব্রহ্ম-স্ফুট-সিদ্ধান্ত রচিত বলে এতে তাঁর নিজস্ব বহু গাণিতিক ও জ্যোতিষীয় আবিষ্কার লিপিবদ্ধ করা আছে।

ব্রহ্ম-স্ফুট-সিদ্ধান্ত নিজের দেশে যেমন খ্যাতি অর্জন করেছিল ঠিক একই ভাবে বিদেশেও এর ব্যাপ্তি প্রচারিত হয়। শেষ বয়সে ব্রহ্মগুপ্ত আরো দুখানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। একটির নাম খণ্ডখাদ্যক, অন্যটির নাম উত্তরখণ্ডখাদ্যক। দুখানা গ্রন্থই জ্যোতিষী বিষয়ক। ব্রহ্ম-স্ফুট-সিদ্ধান্ত পারসী ভাষায় অনূদিত হয় প্রথম। তারপর হয় আরবী ভাষায়। খলিফা-আল-মানসুরের রাজত্বকালে ইব্রাহিম আল্ ফাজারী ও ইয়াকুব ইব্ন বারিক নামে দুই আরব্য পণ্ডিত ব্রহ্মগুপ্তের সিদ্ধান্ত আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন। আরবী ভাষায় সিদ্ধান্তের নাম রাখা হয় 'সিন্দ হিন্দ'। এরপরে খণ্ডখাদ্যক গ্রন্থটিও আরবী ভাষায় অনূদিত হয়। আরবীতে এই গ্রন্থের নামকরণ করা হয়েছিল 'অর্কন্দ'।

বস্তু গতিশীল হয় বিভিন্ন কারণে। ফলে বস্তুর গতিও হয় বহু ধরণের। তার মধ্যেও প্রধানত দু' পর্যায়ে ভাগ করা যায় এই কারণগুলোকে। প্রথম পর্যায়ে বস্তুর সংস্পর্শ। অর্থাৎ যে কোন বস্তুকে গতিশীল হতে

হলে অন্য বস্তুর সংগে সংযোগ হওয়া দরকার। যেমন ধনুকের ছিলার চাপে তীর ছোঁড়া সম্ভব। ধূলারাশি, মেঘ ও পালতোলা নৌকায় গতি সঞ্চারের কারণ বায়ুর চাপ বা প্রবাহ। বস্তুকে গতিশীল করার দ্বিতীয় পর্যায়ে বস্তুর সঙ্গে সংস্পর্শ দরকার হয় না। যেমন প্রাণিদেহের গতি। গাছ থেকে পাতা পড়া। অর্থাৎ ভারী বস্তুর উপর থেকে নিচে পড়ার কারণ ও গুরুত্ব এই সমস্তই প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞানীরা তাঁদের গ্রন্থে লিখে গেছেন। ব্রহ্মগুপ্ত তাঁর জ্যোতিষীয় গ্রন্থে এ জাতীয় পতনের কারণ যে বস্তুর উপর পৃথিবীর আকর্ষণ একথা উল্লেখ করেছেন।

ব্রহ্মগুপ্ত বিভিন্ন জ্যোতিষীয় ব্যাপারে আর্যভটের সংবাদের তীব্র বিরোধিতা করেন। আর্যভট পৃথিবীর আহ্নিক গতি সম্পর্কে যে কথা বলেছিলেন তিনি সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করতেন। গ্রহণ সম্পর্কে বৈদিক হিন্দুদের মতবাদ রাহু কেতু সম্পর্কে ব্রহ্মগুপ্ত আবার নতুন করে বোঝাতে চেষ্টা করেন। অনেকের ধারণা ব্রহ্মগুপ্ত যে আর্যভটের এত সমালোচক ছিলেন তার একমাত্র কারণ ঈর্ষা। আর্যভটের ব্যাপক খ্যাতি এবং তাঁর শিক্ষা ব্রহ্মগুপ্ত সহ্য করতে পারনে নি। তাই তাঁর ব্যবহারে বিরূপতা লক্ষ্য করা যায়। তবু এসব কথা বাদ দিলেও ব্রহ্মগুপ্তের নিজস্ব অবদানের গুরুত্ব কম নয়। তিনি গণনার পদ্ধতি বার করেন, দিনের যে কোন সময় গ্রহদের সঠিক গতি ও অবস্থান কিভাবে নির্ণয় করা যায়। তার পদ্ধতি আবিষ্কার মন্দোচ্চ ও শীঘ্রোচ্চ দেবতা দের প্রভাবে গ্রহদের গতির পরিবর্তন হয় কেমন এবং এছাড়াও লম্বন, সূর্যের উন্নতি, বলন ইত্যাদি জ্যোতিষীয় বিষয়ের সঠিক ভাবে পরিমাপ কিভাবে নেওয়া যায়—এ সবই ব্রহ্মগুপ্তের মৌলিক অবদান।

গণিতের ব্যাপারে ব্রহ্মগুপ্তের অবদান সবচেয়ে বেশি। তাঁর স্বকীয়তার পরিচয় এ বিষয়ে যা মেলে আর কোন কিছুতেই তা মেলে না। তিনি আবিষ্কার করেন প্রথম ও দ্বিতীয় মাত্রার নির্ণেয় ও অনির্ণেয় সমীকরণের সমাধান নিয়ম। বৃত্তের মধ্যে অবস্থিত চতুর্ভুজের সম্বন্ধে নানা তথ্য ব্রহ্মগুপ্তের আবিষ্কারের উল্লেখযোগ্য অবদান। তিনি পিরামিডের আয়তন নির্ণয় সূত্রেরও অধিকর্তা।

চক্রপাণি দত্ত

একাদশ শতকের শেষের দিকে বরেন্দ্রভূমির অন্তর্গত ময়ূরেশ্বর গ্রামে চক্রপাণি দত্ত লোধ্রবলী বংশে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম নারায়ণ। সেই সময় গৌড়েশ্বরের অধিপতি ছিলেন নরপাল। চক্রপাণি দত্তের পিতা নারায়ন নরপালের রন্ধনশালার প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন।

প্রাচীন ভারতের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের মধ্যে চক্রপাণি দত্তের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি যে শুধুমাত্র চিকিৎসকই ছিলেন তাই নয়—রাসায়নিক হিসেবেও চক্রপাণি দত্ত একটি বিশিষ্ট নাম।

সম্ভবত চক্রপাণিই প্রথম ঔষধ হিসেবে কজ্জলীর ব্যবহার প্রচলন করেন। চিকিৎসাবিদ্যায় সেই সময় ভারত এক অন্য রূপ পরিগ্রহ করে। মানুষের অসুখ-বিসুখ নিরাময়ের অদ্ভুত পরিচয় মেলে। চিকিৎসা-বিদ্যার এ সমস্ত উপায় এবং প্রকরণ নিয়ে তিনি বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেছেন 'দ্রব্যগুণ' এবং 'সর্বসার সংগ্রহ'। চিকিৎসা শাস্ত্রে এ দু-খানা বই-ই প্রাচীন ভারতের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

টীকাকার হিসেবেও চক্রপাণি দত্ত যথেষ্ট প্রশংসা পান। তিনি চরক সংহিতার উপর 'চরকতত্ত্ব প্রদীপিকা' নামে একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ টীকা এবং সুশ্রুতের উপর 'ভানুমতী টীকা' রচনা করেন। এর ফলে চক্রপাণি দত্ত দুটো উপাধি লাভ করেন চরক-সংহিতার জন্য 'চরক চতুরানন' এবং সুশ্রুতের জন্য 'সুশ্রুত-সহস্রনয়ন।'

আয়ুর্বেদোত্তর কালে হিন্দু চিকিৎসা বিজ্ঞানে যে নূতন শাস্ত্র সহজ ভাবে এসে প্রবেশ করে তা হচ্ছে রসায়ন শাস্ত্র। প্রকৃতপক্ষে আয়ুর্বেদের এক অনুষঙ্গ হিসেবেই রসায়নের উদ্ভব। রাসায়নিক হিসেবেও চক্রপাণি দত্ত বিশেষ খ্যাতি পেয়েছিলেন। তিনি আবিষ্কার করেন পারদ গন্ধকঘটিত লবণ (মারকারি সালফাইড) কজ্জলী বা রসপর্পটি।

চক্রপাণি দত্ত পারদ, তাম্র, লৌহ, রৌপ্য প্রভৃতি ধাতুর কয়েকটি যৌগিক প্রস্তুত প্রণালী লিখেছেন। এবং কিছু কিছু যৌগিক প্রস্তুত প্রসঙ্গে তিনি পারদ শোধনের উপায় বলেছেন। কোন কোন প্রণালীতে তা করা সম্ভব।

ভাস্কর

ভারতীয় প্রাচীন হিন্দু গণিতজ্ঞদের মধ্যে ভাস্কর ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি জন্মগ্রহণ করেন ১১১৪ খ্রী.। পশ্চিমঘাটে সহ্য পর্বতের কাছে কর্ণাট প্রদেশের অন্তর্গত বিজ্জবিড় বা অধুনিক বিজাপুরে ভাস্কর বাস করতেন। পিতা দৈবজ্ঞ চুড়ামণি মহেশ্বর উপাধ্যায়। শাণ্ডিল্য গোত্রীয় কানাড়া ব্রাহ্মণ। বিদ্বান, পণ্ডিত ও জ্যোতির্বিদ হিসাবে ভাস্করের পূর্ব-পুরুষদের বিশেষ খ্যাতি ছিল। এই তথ্য জানা যায় ভাউদাজীর আবিষ্কৃত তাম্রফলক দেখে। নাসিক থেকে ৭০ মাইল দূরে চালিস গাঁয়ে তাম্রফলকের হদিস পাওয়া গিয়েছিল।

জ্যোতিষে ভাস্করের প্রতিভা ছিল আর্যভট ও ব্রহ্মগুপ্তের সঙ্গে তুলনীয়। ভাস্করের প্রতিভা মধ্যাহ্ন সূর্যের মত প্রদীপ্ত হলেও তাঁর আবির্ভাব কালকে ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধ্যাহ্ন বলা যায় না। কেননা সে সময় এ দেশে জ্ঞান-বিজ্ঞানের শাখায় অবনতি হতে শুরু করেছে। তাই ভাস্করের আবির্ভাবকে দীপ নেভার আগের মুহূর্তের সঙ্গে তুলনা করা হয়। কিন্তু সেই সময় ইউরোপে আবার জ্ঞান-বিজ্ঞানের নবজন্মের দিন। আস্তে আস্তে বিজ্ঞানের জগৎ তখন প্রসার লাভ করছে।

ভাস্করের রচিত সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'সিদ্ধান্ত শিরোমণি'। এই গ্রন্থটি রচনা করার সময় তাঁর বয়স ছিল ৩৬ বছর। সিদ্ধান্ত শিরোমণি গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয় চারখণ্ডে। লীলাবতী, বীজগণিত, গ্রহ গণিতাধ্যায় এবং গোলাধ্যায়। প্রথম দুখানি গ্রন্থ গণিত নিয়ে, পরের দু খণ্ডে আলোচিত হয়েছে জ্যোতিষ নিয়ে।

সিদ্ধান্ত শিরোমণি লেখার ৩৩ বছর পর অর্থাৎ ১১৮৩ খ্রী. ভাস্কর রচনা করেন করণ-কুতূহল নামে একটি করণ গ্রন্থ। অন্যান্য আর গ্রন্থের মধ্যে সর্বতোভদ্র যন্ত্র ভাস্করের আর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এই গ্রন্থ-খানির বিষয় কাল-পরিমাণ বিষয়ক।

পাটিগণিত গ্রন্থ লীলাবতী ভাস্কর রচিত এক জগদ্বিখ্যাত বই। কেন এই বইয়ের নাম লীলাবতী রাখা হয়েছিল সে বিষয়ে অনেক গল্প চালু

আছে। প্রথম প্রবাদ : লীলাবতী ছিলেন ভাস্করের কন্যা। লীলাবতী ছিলেন বালবিধবা। ভাস্কর তাঁর এই কন্যাকে পাটিগণিত শেখানোর জন্য সিদ্ধান্ত-শিরোমণির পাটিগণিত খণ্ডটি রচনা করেন এবং তাঁর এই কন্যার নাম অনুসারে গ্রন্থটির নাম রাখা হয় লীলাবতী।

দ্বিতীয় প্রবাদ : ভাস্করের সহধর্মিণীর নাম ছিল লীলাবতী। তাঁর কোন সন্তান ছিল না। তাই ভাস্কর দুঃখিনী পত্নীর নাম চিরস্মরণীয় করার জন্য গ্রন্থের নামকরণ করেন লীলাবতী। এই প্রবাদগুলো শুধু মাত্রই প্রবাদ। এর কোন সত্যতা আছে বলে মনে হয় না। কেননা গ্রন্থে অয়ি বালে লীলাবতী, ব্রুহি সখে, ব্রুহি কান্তে, বৎসে, বালে বাল-কুরঙ্কলোলনয়নে ইত্যাদি যে সব সম্বোধন আছে তা কখনোই কন্যা কিংবা পত্নীকে সম্বোধন করা যায় না। তাই মনে হয় লীলাবতী হয়তো কোন কাল্পনিক নাম। এই নামের মধ্য দিয়ে ভাস্কর তাঁর নিজের নামের মাধুর্য এবং লালিত্যকে বজায় রাখতে চেষ্টা করেছেন।

গাণিতিক ও জ্যোতিষীয় আলোচনায় ভাস্কর ব্রহ্মগুপ্ত শ্রীধর ও পদ্ম-নাভর গ্রন্থাদির সাহায্য নিয়েছেন। বীজগণিতের এক আলোচনা প্রসঙ্গে কোন নির্দিষ্ট রাশিকে শূন্য দিয়ে ভাগ করলে তার ফল কি হবে তা নির্ণয় করেন ভাস্কর। অজ্ঞাত রাশি প্রকাশ করার জন্য দেবনাগরী বর্ণ-মালার ব্যবহার করার প্রস্তাব করেন তিনি। বিভিন্ন ধরণের সমীকরণ সমাধানের রীতির উদ্ভাবক এক কথায় ভাস্কর।

জ্যামিতির ক্ষেত্রেও ভাস্করের অবদান উল্লেখযোগ্য। তাঁর মৃত্যুর পাঁচশো বছর পরে নিউটন এবং লাইবনিৎজের কাজ করার রীতিতে ভাস্করের সময়-গণিতের আভাস পাওয়া যায়। সময়ের সূক্ষ্ম ব্যবহার সম্বন্ধে ভাস্করের ধারণা সুস্পষ্ট ছিল। তিনি এক সেকেণ্ডকেও চৌত্রিশ হাজার ভাগে ভাগ করে দেখাতে পেরেছিলেন। এই সময়ের ভগ্নাংশকে ভাস্কর নাম দিয়েছিলেন 'ত্রুটি'।

জলে যে তলটানের প্রভাব আছে এ কথাও ভাস্করের জানা ছিল। জলের উপর তেল ঢাললে তা জলের উপর ছড়িয়ে পড়ে—এই তথ্য তিনি উল্লেখ করেছেন। এটা অবশ্য খুবই প্রাচীন আবিষ্কার। প্রাচীন গ্রীক নাবিকরা ঝড়ের সময় সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ শান্ত করার জন্য সমুদ্রের উপর তেল ঢেলে দিত। প্রাচীন ভারতের গণিতজ্ঞদের মধ্যে ভাস্কর উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। তাঁর প্রভাব বহুদিন পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল এদেশে তা সিদ্ধান্ত শিরোমণির প্রচার এবং জনপ্রিয়তা থেকে স্পষ্ট অনুমান করা যায়।

আধুনিক ভারতের
বিজ্ঞানী

মহেন্দ্রলাল সরকার

কিছু কিছু দিন থাকে যা মানুষ কোনদিনই ভুলতে পারেনা। ভারতের বিজ্ঞানের ইতিহাসে সেরকমই একটি দিন ১৮৭৬ খ্রী. ১৫ই জানুয়ারি। এই দিনটির কথা ভারতের বিজ্ঞান সম্পর্কে মানুষ চিরদিন শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে। এই দিন স্থাপিত হয় ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অফ সায়েন্স [Indian Association for the Cultivation of Science]. যাঁর অকুণ্ঠ চেষ্টায় এই প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে তিনিই ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার।

ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার ১৮৩৩ খ্রী. ২রা নভেম্বর কলকাতার কাছেই হাবড়া থানায় জন্মগ্রহণ করেন। গ্রামের নাম পাইকপাড়া। পিতা ছিলেন সাধারণ মধ্যবিত্ত অবস্থার লোক। খুব ছোট বেলায় মহেন্দ্রলাল বাবা মা দুজনকেই হারান। প্রথমে হারান বাবাকে তখন তাঁর বয়স মাত্র পাঁচ বছর। সেই সময় মা তাকে নিয়ে কলকাতায় নেবুতলায় মামা বাড়িতে আসেন। এরপর থেকে মহেন্দ্রলালের জীবন শুরু হয় মামা বাড়িতে।

মামা ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ ও মহেশচন্দ্র ঘোষ ভাগনে মহেন্দ্রলালকে ছেলের মত স্নেহ করতেন। ছোটবেলা থেকেই মহেন্দ্রলালের পড়াশোনায় মনযোগ, আগ্রহ এবং জ্ঞানের পিপাসা—সবাইকে অভিভূত করে দিয়েছিল। তিনি হেয়ার সাহেবের বিদ্যালয় থেকে জুনিয়ার স্কলারশিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে [১৮৯৪ খ্রী,] হিন্দু কলেজে [বর্তমান প্রেসিডেন্সি কলেজ] ভর্তি হন।

বিজ্ঞান পাঠের আগ্রহ মহেন্দ্রলালের ছোটবেলা থেকেই। কিন্তু সে সময় একমাত্র মেডিক্যাল কলেজ ছাড়া বিজ্ঞান শিক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিলনা তাই তিনি ১৮৫৫ খ্রী. মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন।

শুরু হল তাঁর চিকিৎশাস্ত্র নিয়ে পড়াশোনা। উৎসাহ এবং উদ্দিপনা মহেন্দ্রলালকে এক নতুন জীবনের পথে নিয়ে এল। সে সময় মেডিক্যাল

কলেজে যতগুলো পুরস্কার, পদক ও বৃত্তি ছিল সবগুলোই একে একে পেয়েছিলেন। তাই শিক্ষক অধ্যাপক সবার কাছেই মহেন্দ্রলাল ছিলেন খুব প্রিয় পাত্র। ছাত্রজীবনে তাঁর একমাত্র তপস্যা ছিল অধ্যয়ন।
মহেন্দ্রলাল ১৮৬০ খ্রী. মেডিক্যাল কলেজের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এস. এম. এস. ডিগ্রী লাভ করেন। এর তিন বছর পর তিনি এম. ডি. পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ভারতবাসীদের মধ্যে তিনি দ্বিতীয় ব্যক্তি যিনি এম. ডি. হওয়ার গৌরব অর্জন করেন।

এরপর থেকেই ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের জীবনের মোড় ঘুরে যায়। চিকিৎসক হিসেবে পসার বাড়ে। কলকাতায় ব্রিটিশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের একটি শাখা স্থাপিত হয়, উদ্যোক্তা ছিলেন ডাক্তার সূর্যকুমার চক্রবর্তী। এই শাখায় বড় বড় এলোপ্যাথ ইংরেজ ও বাঙালী চিকিৎসক সভ্য হন। মহেন্দ্রলাল মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের প্রথম সম্পাদক মনোনীত হন এবং এর তিন বছর পর তিনি হন সহকারী সভাপতি।
এই সময় একটি ঘটনা মহেন্দ্রলালের জীবনে এবং তাঁর চিকিৎসা পদ্ধতিতে বিপ্লব ঘটিয়ে দিল। তাঁর এক বন্ধু তাকে ফিলজফি অফ হোমিওপ্যাথি নামে একটি বই দিয়েছিলেন সমালোচনার জন্য। তিনি এই বইটি বার বার করে পড়ে নতুন এক জ্ঞানের আলো পান। ডাক্তার মহেন্দ্রলালের হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধে ধারণা সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। তিনি এরপর এই নতুন বিষয় নিয়ে আরো জ্ঞান বাড়ানোর জন্য বিদেশ থেকে ভাল ভাল বই এনে পড়াশোনা করতে শুরু করেন। শুধুমাত্র বই পড়েই তিনি থেমে থাকেননি। বৈজ্ঞানিক উপায়ে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার ফলাফল লক্ষ্য করতে থাকেন এবং বুঝতে পারেন এটাই চিকিৎসার বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতি।

প্রথম প্রথম ডাক্তার মহেন্দ্রলালের এই মত পরিবর্তনের ফলে অনেক চক্রান্ত সহ্য করতে হয়েছিল। প্রায় ছ'মাস তিনি এক পয়সাও উপার্জন করতে পারেননি। কিন্তু তাঁর অবিচল বিশ্বাস ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা তাঁকে একটুও টলাতে পারেনি। কয়েক বছরের মধ্যেই তাঁর হোমিওপ্যাথিতে প্রচুর পয়সা হল। ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের পসার জমে উঠল তুঙ্গে। এমনও নজির আছে তিনি এক দিনে কোন কোন রোগীর কাছ থেকে দু'শ টাকা ভিজিটও নিয়েছেন।

মহেন্দ্রলাল ছোটবেলা থেকেই বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। তাঁর জীবনের একমাত্র সাধনা ছিল বিজ্ঞান চর্চা। তিনি এটা ভালভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন একটা দেশকে উন্নত হতে হলে তাকে বিজ্ঞানে অনুশীলন নিতে হবে। বিশেষ করে ভারতবর্ষের মত দেশের। এই বিজ্ঞান চর্চার আবশ্যকতা ভেবে তিনি নিজের জীবন বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত ছিলেন।

প্রথম প্রথম ডাক্তার সরকার নিজের বাড়িতে বিজ্ঞান ক্লাস খোলেন। প্রত্যেক দিন সন্ধ্যাবেলা এই ক্লাসে তিনি বক্তৃতা দিতে শুরু করেন। এই থেকেই তাঁর মনে একটি বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান স্থাপন করার কথা মনে হয়। এবং সে সংকল্পের কথা পত্রিকায় প্রকাশ করে বিজ্ঞানচর্চার আন্দোলন চালাতে লাগলেন। এর ফলেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি. এ. ক্লাশে বিজ্ঞান শিক্ষা চালু হল। এভাবে প্রায় ছ বছর চেষ্টার পর ১৮৭৬ খ্রী. ১৫ই জানুয়ারী কলকাতায় 'সায়েন্স এসোসিয়েশন' জন্ম নেয়। এই প্রতিষ্ঠানে সম্পূর্ণভাবে দায়িত্বে ছিলেন দেশের লোক।

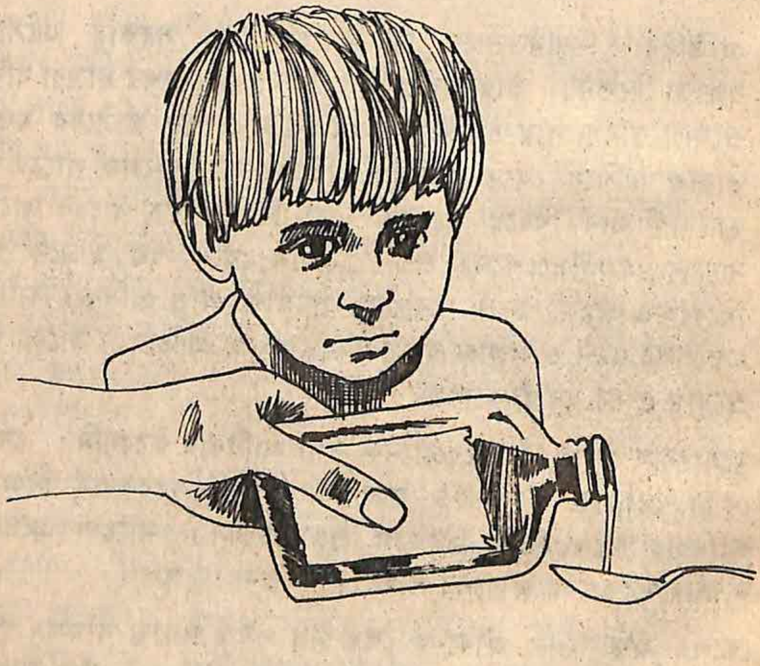
প্রতিদিন নিয়মিতভাবে ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার এসোসিয়েশনে বক্তৃতা দিতেন। তাঁর ধারণা ছিল, আমাদের দেশের ছাত্ররা যদি ঠিকমত সুযোগ সুবিধা পায় তাহলে অন্য যে কোন দেশের ছাত্রদের মত বিজ্ঞানে তারাও এগিয়ে যেতে পারবে। বিশেষ করে কলেজ পাঠের পর যাতে ছাত্ররা বিজ্ঞান বিষয়ে গবেষণা এবং চর্চা করতে পারেন তাদের জন্যই সায়েন্স এসোসিয়েশনের জন্ম। এখান থেকে বহু ছাত্রকে খরচ করে বিদেশেও পাঠান হয়। নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক স্যার চন্দ্রশেখর রমন ও অন্যান্য বহু বৈজ্ঞানিক এই প্রতিষ্ঠানে তাঁদের গবেষণার সুযোগ পেয়ে যশস্বী হয়েছেন।

মহেন্দ্রনাথ নিজে কোন বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিষ্কার করেননি। সেই অর্থে কোন মৌলিক গবেষণাও করেননি। কিন্তু ভারতবর্ষে বিজ্ঞান চর্চার আদিগুরু বলে তিনি চিরকাল পূজ্য হবেন। সায়েন্স এসোসিয়েশন ডাক্তার সরকারের জীবনের সাধনা। কল্পনা। স্বপ্ন।

দেশের জন্য তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। এরই ফলে মহেন্দ্রলাল শেষ জীবনে দুর্বল হয়ে পড়েন। তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে যায়। তিনি হাঁপানিতে আক্রান্ত হন। তবু রোগ শরীর নিয়ে একদিনের

জন্যও তিনি সায়েন্স এসোসিয়েশনের বক্তৃতা বন্ধ করেননি। এই বিজ্ঞান-প্রেমিক মহাপ্রাণ মানুষটি ১৯০৪ খ্রী. ২৩শে ফেব্রুয়ারী শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করে চলে যান।

ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার সেই সময়ের সমস্ত বড় বড় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের সভ্য এবং আর্টস্ ফ্যাক্যালটির সভাপতি মনোনীত হন। ভারত সরকার তাঁকে সি. আই. ই. উপাধি দিয়েছিলেন। বহু বছর তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির সভ্য ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে অনারারী ডি. এল. উপাধি দেন। এ ছাড়া তিনি বিদেশের অনেক বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। শেষ বয়েসেও তাঁর পড়ার অভ্যাস ছিল। ডাক্তারের তৈরী গ্রন্থাগারটি ছিল বিজ্ঞান জগতের এক অমূল্য সম্পদ।



চার্লস কামিং ক্যালডার

উত্তর স্কটল্যাণ্ডের মরিশায়ারের প্রেসলিতে চার্লস কামিং ক্যালডার জন্মগ্রহণ করেন। সে দিনটা ছিল ১৮৮৪ খ্রী. ৩রা ডিসেম্বর। তাঁর পিতা ছিলেন জর্জ ক্যালডার নামকরা প্রোটেস্টাণ্ট পরিবারের একজন চাষী। বড় দাদা স্যার উইলিয়াম ময়র ক্যালডার অধ্যাপক, এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়। ছোট ভাই অ্যাবার্ডিন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক। দু বোনের একজনের বিয়ে হয় উইলিয়াম ম্যাকরে'র সঙ্গে। ইনি ছিলেন একজন ভারতীয় কৃষি বিভাগের প্রথিতযশা ছত্রাক বিজ্ঞানী।

চার্লস-এর ছোটবেলা পড়াশোনা হয় স্কটল্যাণ্ডের পুরনো স্কুলে। তারপর পড়েন রর্বাট গর্ভনস্ কলেজে এবং শেষে অ্যাবার্ডিন বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিষয় কৃষিবিদ্যা। এর পর বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে উদ্ভিদবিদ্যা নিয়ে তিনি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কোর্স করেন।

১৯০৯ খ্রী. চার্লস ফিরে আসেন অ্যাবার্ডিন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করার জন্য। কিন্তু সেখানে কিছু দিন থাকার পর দি রয়্যাল বোটানিক্যাল গার্ডেন, ক্যালকাটার কিউরেটর বা তত্ত্বাবধায়কের পদ পান। তখনকার দিনে এটি একটি অত্যন্ত মর্যাদা সম্পন্ন পদ।

ক্যালডার চার্লস ভারতবর্ষে আসেন ১৯১২ খ্রী. ২২-এ মার্চ। বোটানিক্যাল গার্ডেন এবং কিউরেটরের পদে এলেও মাঝে মাঝেই তাকে সুপারিনটেন্‌ডেণ্ট এবং ডাইরেক্টরের পদে বহাল হতে হত সেই সেই পদের অধিকর্তার অবর্তমানে। এমনকি চার্লসকে যুদ্ধেও যোগ দিতে হয়েছিল।

তখন চলছে প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধ। ১৯১৮ খ্রী. এপ্রিল মাস থেকে ১৯১৯ খ্রী. পর্যন্ত মিলিটারিতে অ্যাকটিং ক্যাপটেনের পদে নিযুক্ত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রেও যেতে হয়েছিল।

শেষ পর্যন্ত ১৯২৫ খ্রী. ২রা মে ক্যালডার বোটানিক্যাল গার্ডেনের

অধিকর্তার পদ পান। এই সময় তাঁর অধীনে শুধুমাত্র শিবপুরের বোটানিক্যাল গার্ডেনই ছিল না। তাছাড়াও ছিল দার্জিলিং-এর লয়েড বোটানিক গার্ডেন, কলকাতার, ইডেন, কার্জন এবং ডালহৌসি স্কোয়ার এবং তাছাড়াও বাংলার সিঙ্কোনা চাষের বিভাগ। বর্মা-তে সিঙ্কোনা চাষের যে বাগান ছিল তাও চার্লসকেই দেখাশোনা করতে হত। এককথায় বলা চলে সিঙ্কোনা এবং কুইনাইন সম্পর্কে সর্বেসর্বা বলতে তখন ভারত সরকারের একমাত্র তিনিই ছিলেন।

কাজের চাপ থাকার জন্য স্বভাবতই চার্লস ক্যালডারকে সময় মেপে মেপে চলতে হত এবং বিশেষ করে সিঙ্কোনা চাষের দিকে নজর রাখতে হত ভাল করে। তিনি রামস্বামীর সহযোগিতায় কাজ করেন ত্রিবাঙ্কুরের উদ্ভিদের ওপর। এবং এ ছাড়াও মিলিটারীতে থাকা কালীন যখন মেসোপটেমিয়ায় ছিলেন তিনি সংগ্রহ করেছিলেন গাছের চারা—বাগদাদ, বেইজি শেরসাত, মৌসাল এবং বাসরা থেকে। এ সংগ্রহের ওপর কোন রচনা করেননি চার্লস। তিনি যে সমস্ত চারা গাছ ইরাক থেকে সংগ্রহ করেছিলেন তা রাখা হয়েছিল লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ামে এবং কলকাতার সেন্ট্রাল ন্যাশানাল হারবেরিয়ামে।

চার্লস সংযুক্ত ছিলেন ভারতবর্ষের ও বিদেশের বিভিন্ন শিক্ষা মূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে। তিনি ছিলেন লেনিন সোসাইটি এবং রয়্যাল হর্টিকালচার সোসাইটি লণ্ডনের ফেলো। ন্যাশানাল ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স অফ ইণ্ডিয়ার প্রতিষ্ঠাতা। এছাড়াও তিনি ছিলেন রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির কাউন্সিলের সদস্য। ভারতে উদযাপিত প্রথমে সায়েন্স কংগ্রেসের [কলকাতায় ১৯২৪ খ্রী.] উদ্ভিদ বিভাগে তিনি প্রধান ছিলেন।

পঁচিশ বছর নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করার পর চার্লস ৩রা ডিসেম্বর ১৯৩৯ খ্রী. চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। এরপর তিনি অ্যাবার্ডিনে ফিরে আসেন। এবং মৃত্যুর শেষ দিন পর্যন্ত তিনি এখানেই কাটিয়েছেন। তাঁর মৃত্যু হয় ১৯৬২ খ্রী. ১৮ই এপ্রিল।

জগদীশচন্দ্র বসু

প্রকাণ্ড এক হল ঘর। বিরাট সভা বসেছে। সবাই উৎসুক হয়ে তাকিয়ে আছেন এক তরুণ বক্তার দিকে। বিচিত্র সব যন্ত্রপাতি সামনে রেখে সেই তরুণ বক্তৃতা করে চলেছেন। হঠাৎ এক আশ্চর্য কাণ্ড ঘটল। খুব জোরে পিস্তলের মতো আওয়াজ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পঁচাত্তর ফিট দূরে এক বন্ধ ঘরে রাখা বারুদের স্তূপ উড়ে গেল।

এ এক অসম্ভব ব্যাপার! না কি যাদু? সবাই বিস্ময়ে অভিভূত। কিছুক্ষণের মধ্যে প্রত্যেকেই বুঝতে পারলো মঞ্চে দাঁড়িয়ে যে তরুণ এতক্ষণ বক্তৃতা করছিলেন তাঁর সামনে রাখা যন্ত্র থেকেই বিদ্যুৎ তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে এমন বিস্ময়কর ঘটনা ঘটল।

এই যে অদ্ভুত কাণ্ডটি ঘটল, এর মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে বিজ্ঞানের এক বিরাট রহস্য—বিনা তারে বিদ্যুৎ প্রেরণের গূঢ় সংকেত। এই যন্ত্রটির উদ্ভাবক এক বাঙালী তরুণ বিজ্ঞানী। নাম জগদীশচন্দ্র বসু। সংক্ষেপে জে. সি. বোস। ইংরেজী ১৮৯৫ খ্রী. জগদীশ চন্দ্র এই ভাবনার কথা ভাবতে পেরেছিলেন। তখনো পৃথিবীর মানুষ বেতার বার্তার কথা ভাবতেই শেখেনি।

ঢাকা জেলায় বিক্রমপুরে রাড়িখাল নামে একটি গ্রাম আছে। জগদীশ চন্দ্র এই গ্রামে ১৮৮৫ খ্রী. ৩০শে নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ভগবানচন্দ্র বসু তখন ফরিদপুরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। জগদীশচন্দ্রের ছোটবেলা সেখানেই কাটে। ছোটবেলায় জগদীশচন্দ্র যাত্রা-অভিনয় দেখতে ভালবাসতেন। রামায়ণ ও মহাভারতের বীরদের কাহিনী তাঁর চরিত্রে গভীর রেখাপাত করেছিল।

জগদীশ চন্দ্রের গ্রামের বিদ্যালয়ের পড়া শেষ হলে কলকাতায় এসে সেন্টজেভিয়ার্স স্কুলে ভর্তি হন। এই শিক্ষায়তন থেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়ে ষোল বছর বয়সে তি নে প্রথম বিভাগে পাশ করেন। তিনি এর

পর সেন্টজেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি হন। এই কলেজে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির একটি যাদুঘর আছে। এই যন্ত্রপাতি জগদীশচন্দ্রকে মুগ্ধ করে দেয়। তিনি এফ. এ. তারপর বিজ্ঞান নিয়ে বি. এ. পাশ করেন।

জগদীশ চন্দ্র ভেবেছিলেন বি. এ. পাশ করার পর সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিয়ে জজ ম্যাজিস্ট্রেট কিছু একটা হবেন। কিন্তু পিতার ইচ্ছে বিলেতে যেয়ে তিনি বিজ্ঞান পড়েন। তাই আই. সি. এস.-এর মোহ তাঁকে ছাড়তে হয়। শেষে ডাক্তারি পড়ারজন্য জগদীশ চন্দ্র বিলেতে যাত্রা করেন। কিন্তু লণ্ডনে পৌঁছে চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন করা হল না। কেম্ব্রিজে গিয়ে তিনি বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হলেন। চার বছর পড়াশোনা করার পর জগদীশ চন্দ্র কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞানে ট্রাইপস লাভ করেন। একই সময়ে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি বি. এস. সি. উপাধিও লাভ করেছিলেন।

দেশে ফিরে জগদীশ চন্দ্র কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থবিদ্যার অস্থায়ী অধ্যাপক নিযুক্ত হন। কিন্তু এই পদে শ্বেতাঙ্গ অধ্যাপকগণ যে বেতন পেতেন তার অর্ধেক তাঁকে দেওয়া হল। তারপরও এই পদ অস্থায়ী বলে সেই বেতনেরও অর্ধেক কেটে দেওয়া হয়। এই ব্যবহারে স্বাধীনচেতা জগদীশ চন্দ্রের আত্মসম্মানে আঘাত লাগে। তিনি ঠিক করলেন বেতন গ্রহণ করবেন না, কিন্তু চাকরিও ত্যাগ করলেন না। তিন বছর বিনা বেতনে তিনি কাজ চালিয়েছিলেন। কলেজের কর্তৃপক্ষ তাঁর কর্তব্য নিষ্ঠা ও বিজ্ঞানে তাঁর অনুরাগ দেখে সন্তুষ্ট হন। এর ফলে তিনি চাকরীতে পূর্ব বেতনে স্থায়ীত্ব হলেন এবং সঙ্গে তিন বছরের বেতনও পেলেন।

জগদীশ চন্দ্র যখন প্রেসিডেন্সি কলেজে যোগদান করেন, তখন কলেজে উপযুক্ত গবেষণাগার ছিল না। তিনি দশ বৎসর চেষ্টা করার পর একটি ছোট গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হন। তিনি গবেষণা করে বিদ্যুৎ সম্বন্ধে তাঁর প্রথম বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিষ্কার করেন। এই আবিষ্কারের জন্য তিনি বিলেতের বৈজ্ঞানিক মহলে প্রশংসালাভ করেন। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডক্টরেট উপাধি দিয়ে প্রসংশা করেন। লণ্ডনের রয়াল সোসাইটি তাঁর গবেষণা চালানোরজন্য তাঁকে অর্থ সাহায্য করেন। এরপর জগদীশ চন্দ্র বিনা তারে বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ বার্তা পাঠানোর সম্বন্ধে গবেষণা করেন। তিনিই জগতে প্রথম এরকম বার্তা প্রেরণে

সক্ষম হন। এই সময় বিজ্ঞান জগতে জগদীশ চন্দ্রের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। বিলেতের প্রসিদ্ধ রয়্যাল সোসাইটি তাঁকে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ করেন। এই নিমন্ত্রণ যে কোন এক বৈজ্ঞানিকের পক্ষে খুবই সম্মানের।

এরপর জগদীশচন্দ্রের গবেষণার বিষয় হল অন্য। তিনি জগতকে এক নতুন জ্ঞানের সন্ধান দিলেন। উদ্‌ঘাটন করলেন নতুন তথ্য। উদ্ভিদ ও প্রাণী একইভাবে উত্তেজনায় সাড়া দেয়। চিমটি কাটলে, আঘাত করলে কিংবা কোন কিছু ছোঁয়ালে উদ্ভিদ মানুষেরই মত উত্তেজিত হয়। উদ্ভিদ প্রাণীর মত ক্লান্ত হয়। জগদীশচন্দ্র দেশীয় যন্ত্রপাতি দিয়ে একটি সূক্ষ্ম যন্ত্র তৈরী করলেন। এই যন্ত্র উদ্ভিদের মুহূর্তের বৃদ্ধি এবং উদ্ভিদের ওপর বিভিন্ন উত্তেজক দ্রব্যের, বিভিন্ন খাদ্যের ও বিভিন্ন বিষের ক্রিয়ার ফল বহুগুণ বাড়িয়ে লিখতে পারে। এই শ্রেষ্ঠ যন্ত্রটির নাম 'ক্রেস্কো-গ্রাফ'। গাছের ওপর আলো ফেললে, গাছকে অন্ধকারে রাখলে, গাছে চিমটি কাটলে, গাছে বিষ প্রয়োগ করলে যে সামান্য পরিবর্তন হয়, তা দশ লক্ষ থেকে কোটি গুণ বেড়ে এই যন্ত্রে ধরা পড়ে। এই সূক্ষ্ম যন্ত্র দিয়ে এক সেকেণ্ডের হাজার ভাগের একভাগ সময় ঠিক করা যায়।

এই আবিষ্কার জগদীশচন্দ্রকে এক চরম পর্যায়ে পৌঁছে দিল। নাম হল যেমনি তেমনি একদল বৈজ্ঞানিক চক্রান্ত করে তাঁর বিরুদ্ধাচরণও করতে শুরু করল। এমন কি তাঁর প্রবন্ধ চুরি করে অন্যের নামে প্রকাশ হয়। সেই চুরি অবশ্য পরে ধরা পড়ে। শেষ পর্যন্ত জগদীশচন্দ্রের জয় হয়।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে জগদীশচন্দ্রের নিমন্ত্রণ আসে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য। তিনি বিদেশ থেকে বহু সম্মান ও উপাধি পান। ১৯২০ খ্রী. রয়্যাল সোসাইটির সদস্য [F. R. S] নির্বাচিত হন। স্যার উপাধি পান তৎকালীন ভারত সরকারের কাছ থেকে। তাঁর সম্মানের জন্য তাঁকে আমরণ অধ্যাপক বলে মানা হয়।

কলকাতায় বসু বিজ্ঞান মন্দির ১৯১৭ খ্রী. ৩০শে নভেম্বর স্থাপিত হয়। এটি জগদীশচন্দ্রের আর একটি স্মরণীয় কীর্তি। এর স্থাপনার দুটি উদ্দেশ্য। প্রথমটি হল ভারতীয় বিজ্ঞান সাধকদের নতুন তত্ত্ব আবিষ্কার

দ্বিতীয়টি সেই নতুন তত্ত্ব জগৎসভায় প্রচার। ভারতবর্ষ জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অপরের কাছে চিরকাল ঋণী থাকবে না। তবেই'ত দেশের গৌরব। জগদীশচন্দ্র বসু শুধু বৈজ্ঞানিক ছিলেন না, তিনি সাহিত্যিকও ছিলেন। তিনি নিজের মৌলিক গবেষণার বিষয় প্রথমে বাঙ্‌লা ভাষায় লিখতেন এবং নিজের আবিষ্কৃত সমস্ত যন্ত্রগুলোর বাঙ্‌লা নামকরণ করেছিলেন। তিনি একখানি মাত্র বাঙলা বই আমাদের উপহার দিয়েছেন, নাম 'অব্যক্ত'। বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধের সংকলন।

জীবনের শেষ ক'বছর তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। ১৯৩৭ খ্রী. ২৩শে নভেম্বর এই মহাপ্রাণ বিজ্ঞানী শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুর সময় তিনি ছিলেন গিরিডিতে।



প্রফুল্লচন্দ্র রায়

প্রফুল্লচন্দ্র ১৮৬১ খ্রী. খুলনা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। গ্রামের নাম রাড়ুলি—কাটিপাড়া। পিতা হরিশ্চন্দ্র ছিলেন উদার এবং বিদ্যোৎসাহী। তিনি পারস্য ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। শিক্ষার ভালভাবে বিস্তার হওয়ার জন্য হরিশ্চন্দ্র নিজেদের গ্রামে একটি মধ্য-ইংরেজী বিদ্যালয় ও একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। প্রফুল্লচন্দ্র প্রথমে স্কুলেই পড়তেন পরে পিতার সঙ্গে কলকাতায় এসে হেয়ার স্কুলে ভর্তি হন।

কলকাতায় আসার কিছুদিন পর প্রফুল্লচন্দ্র আমাশায় অসুস্থ হয়ে পড়েন। স্কুলে যাওয়ার ক্ষমতা থাকেনা। এই সময় তিনি বাবার লাইব্রেরীর প্রচুর বই পড়ে ফেলেন। ফলে তাঁর পাঠ অভ্যাস তৈরী হয় এবং এই অভ্যাস প্রফুল্লচন্দ্রের শেষ জীবন পর্যন্ত ছিল। দু বছর অসুস্থ থাকার পর প্রফুল্লচন্দ্র আবার ভালভাবে পড়াশোনা করতে শুরু করেন। প্রথমে পড়েন অ্যালবার্ট স্কুলে। এরপর এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে মেট্রোপলিটন কলেজে এফ. এ. ক্লাসে ভর্তি হন। তারপর বি. এ. পাশ না করেই তিনি বিদেশে এডিনবরায় যান। এখানে এসে তিনি বিজ্ঞান নিয়ে অধ্যয়ন করতে শুরু করেন। তিনি বুঝেছিলেন বিজ্ঞান চর্চা ছাড়া জাতীয় উন্নতি অসম্ভব।

প্রফুল্লচন্দ্র এরপর রসায়নশাস্ত্রে গবেষণা করে ডি. এস. সি. উপাধি পান। তাঁর এই গবেষণার জন্য তাঁকে হোপ প্রাইজ পুরস্কার দেয়া হয়। দেশে ফিরে এসে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে রসায়নের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিজ্ঞানে মৌলিক গবেষণা করতে শুরু করেন।

ছাত্রদের কাছে প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন দরদী বন্ধু। গরীব ছাত্ররা এই শিক্ষকের কাছ থেকে অর্থ ও উপদেশ সবকিছু পেয়েই উপকৃত হত।

১৮৯৫ খ্রী. প্রফুল্লচন্দ্র রায় মারকিউরাল নাইট্রাইট নামে একটি পদার্থ আবিষ্কার করেন। এটাই তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার। এই

আবিষ্কার প্রফুল্লচন্দ্রকে প্রচুর খ্যাতি এনে দেয়। তিনি এর পরেও অনেক নাইট্রাইট জাতীয় পদার্থ আবিষ্কার করেন। ১৯১১ খ্রী. পর্যন্ত তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে রসায়নের অধ্যাপক ছিলেন। অবসর গ্রহণ করার আগে তিনি বিভাগীয় প্রধানের পদ পেয়েছিলেন। প্রফুল্লচন্দ্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হয়ে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের মহাসম্মেলনে যোগদান করেন। এবং এই সময় তিনি ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পান ডি. এস. সি. উপাধি। ১৯১০ খ্রী. তিনি বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছিলেন।

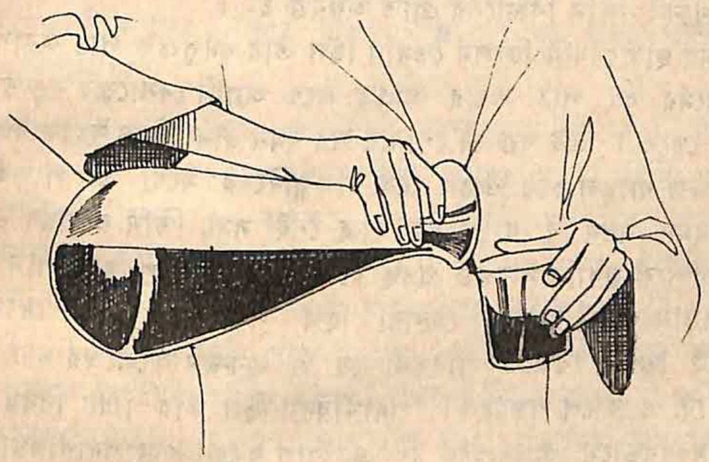
এই বিজ্ঞানীর আর একটি অসাধারণ কাজ 'হিন্দু রসায়ন শাস্ত্রের ইতিহাস' রচনা। কঠিন পরিশ্রমের কাজটি করতে প্রফুল্লচন্দ্রের লেগেছিল দীর্ঘ বার বছর। শুধু গ্রন্থ রচনা করেই তিনি চুপ করে বসে থাকেননি। এর সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি করেছেন একদল নব্যরসায়নিক। এরা প্রত্যেকেই মৌলিক গবেষণা করে জগতে খ্যাতি অর্জন করেন। এদের মধ্যে ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, ডাঃ নীলরতন ধর, ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখার্জী, ডাঃ রসিকলাল দত্ত, ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ সেন প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

এ ছাড়াও প্রফুল্লচন্দ্র বেঙ্গল কেমিক্যাল নামে একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন। এর উদ্দেশ্য, বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে দেশের উন্নতি করা। মাত্র ৮০০ টাকার পুঁজি সম্বল করে প্রফুল্লচন্দ্র আপার সার্কুলার রোডের এক ছোট অন্ধকার ঘরে এই কোম্পানির প্রতিষ্ঠা পায়। বর্তমানে এটি একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান। বাঙালী জাতির কথা ভেবে তাদের দৈন্য দুর্দশা দেখে প্রফুল্লচন্দ্র মনে মনে খুব কষ্ট পেতেন। তাই সমস্ত বাঙালী যুবকরা যেন ব্যবসা ও বাণিজ্যের দিকে ঝোঁকে—তার জন্য তিনি অক্লান্ত চেষ্টা করতেন। সমাজের সেবা করা প্রফুল্লচন্দ্রের একমাত্র ব্রত ছিল। তিনি তাঁর ছোট্ট শরীর নিয়ে সব সময় জনহিতকর কাজে নিজেকে যুক্ত করে রাখতেন।

সমাজ সংস্কারক হিসেবেও প্রফুল্লচন্দ্রের অবদান অনেক। তিনি সংস্কার অস্পৃশ্যতা—এসব ব্যাপারে বক্তৃতা এবং উপদেশ দিতেন। নারীজাতির উন্নতির দিকেও তাঁর নজর ছিল প্রবল। তিনি সবসময় বলতেন এ সমস্ত কিছুর মধ্য থেকে বেরিয়ে আসতে না পারলে একদিন হিন্দুধর্ম পৃথিবী থেকে মুছে যাবে।

প্রফুল্লচন্দ্র বৈজ্ঞানিক হলেও তিনি সাহিত্যচর্চা করতে ভালবাসতেন। সেক্সপীয়ার, মিলটন, ডিকেন্স প্রভৃতি গ্রন্থকারের বই তাঁর প্রিয় পাঠ্য ছিল। তিনি বাংলা ভাষায় যে সমস্ত রচনা করেন তা সাহিত্য সৃষ্টির বড় নিদর্শন।

চিরকুমার প্রফুল্লচন্দ্র সরল জীবন যাপন করতেন। শিক্ষাবিস্তারের জন্য তিনি চেষ্টা করতেন খুব। তাঁর কাছে যে কেউ যখন তখন এসে দেখা করতে পারতো। তিনি ছিলেন ছাত্রদের আদর্শ গুরু। অজাতশত্রু ছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র। তিনি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ছাত্র পরিবৃত হয়ে বাস করতেন। তাঁর বাস করার ঘর ছিল বিজ্ঞান কলেজের একটি ঘর।
এই মনীষি আচার্য ১৯৪৪ খ্রী. ১৬ই জুন দেহত্যাগ করে ইহলোক থেকে বিলীন হয়ে যান।



চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রমন

ত্রিচিনাপল্লীতে ১৮৮৮ খ্রী. ৭ই নভেম্বর রমন জন্মগ্রহণ করেন। রমনের পিতা পদার্থবিদ্যা ও অঙ্কশাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন। সমস্ত জীবন ধরে তিনি শিক্ষকতা করেছেন। এছাড়াও তাঁর সঙ্গীতযন্ত্রের ওপর ঝোঁক ছিল। তিনি যন্ত্র বাজাতে ভালবাসতেন। চন্দ্রশেখরের মধ্যেও বাবার এই সব গুণই বর্তমান ছিল।

ওয়ালটেয়ারে রমনের প্রাথমিক শিক্ষা হয়। রমনের পিতা এখানে অধ্যাপক ছিলেন। ছোটবেলা থেকেই রমন অসাধারণ মেধাবী ছিলেন। ক্লাসের প্রতিটি পরীক্ষায় রেজাল্ট তাঁর ছাত্রজীবনের কৃতিত্বের পরিচায়ক। ছোট বয়স থেকেই তিনি বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হন।

রমন বিজ্ঞানের ছাত্র যেমনি ছিলেন তেমনি ছিল তাঁর ধর্মপুস্তক পাঠ করার আগ্রহ। ধর্মের বই পাঠ করার আগ্রহ জন্মে অ্যানি বেসান্তের বক্তৃতা শোনার পর থেকে। এই বক্ত তা শোনার পর রমন রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ করার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন এবং কিছুদিনের মধ্যে তা পড়েও ফেলেন। রমন যখন বি. এ. ক্লাসের ছাত্র সেই সময় তিনি রামায়ণ ও মহাভারত সম্পর্কে দুখানি সারগর্ভ প্রবন্ধ রচনা করে প্রথম পুরস্কার পান। কলেজে পড়াকালীন রমনের চেহারা ছিল পাতলা। ওঁকে দেখে প্রায় কেউই বিশ্বাস করতে পারতনা যে ও একজন কলেজের ছাত্র। রমন তখন বি. এ. ক্লাশে পড়ছেন। পদার্থবিদ্যা ছিল তাঁর প্রিয় বিষয়। তিনি প্রথম বিভাগে প্রথম হয়ে বি. এ. পাশ করেন এবং পদার্থবিদ্যায় স্বর্ণপদক পান। এর আগে কেউ মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যর প্রথম বিভাগে পাশ করেন নি। যখন তিনি পাঠ্যাবস্থায়, তখন তাঁর দুখানি পদার্থবিদ্যার ওপর লেখা মৌলিক প্রবন্ধ বিলাতের বৈজ্ঞানিক মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। রমনের বৈজ্ঞানিক প্রতিভার এটাই প্রথম বিকাশ।

এই সময় রমনের শরীর অত্যন্ত দুর্বল ছিল। ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী খুব বেশি নড়াচড় নিষেধ। তাই তিনি বিদেশে যাওয়ার ডাক পেয়েও সেখানে যেতে পারলেন না।

আঠার বছর বয়েসে রমন দেশে একটা বড় চাকরি পেলেন। এই চাকরি পাওয়ার যোগ্যতা তিনি অর্জন করেছিলেন ফাইনান্স প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিয়ে। রমন সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে এই পরীক্ষায় প্রথম হয়েছিলেন।

চাকরি পাওয়ার পর রমন কলকাতায় বদলি হয়ে আসেন। কঠোর পরিশ্রম করে তাঁকে রাজকার্য করতে হ'ত কিন্তু আসলে তাঁর মন পড়েছিল বিজ্ঞান চর্চার দিকে। তিনি মনে প্রাণে খুঁজছিলেন মৌলিক গবেষণা করার সুযোগ। কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর সে আশা পূর্ণ হ'ল। তিনি ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সন্ধান পেলেন। এবং কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা করে গবেষণা করার অনুমতিও পেলেন। কলকাতায় তখন বৈজ্ঞানিক ও প্রভাবশালী লোকের ছড়াছড়ি। রমন ধীরে ধীরে এদের সংস্পর্শে আসেন। তার মধ্যে আশুতোষ ও স্যার গুরুদাসের নাম উল্লেখযোগ্য।

এই সময় মাত্র তিন বছর রমন কলকাতায় ছিলেন। তিনি একটু সময়ও বৃথা ব্যয় করেননি প্রতিটি অবসর মুহূর্ত তিনি গবেষণাগারে অতিবাহিত করেন। কলকাতা থেকে তিনি বদলি হয়ে যান রেঙ্গুনে। রমনের রেঙ্গুনে থাকাকালীন সময়ে একটা নতুন যন্ত্র এসেছিল। তিনি শোনামাত্র একদিন সেই যন্ত্রটি দেখার জন্য ছুটে চলে যান। রাত দুপুরে সেখানে পৌঁছে যন্ত্রটি দেখে আবার সকালে বাড়ি এসে পৌঁছান এবং তারপর যথারীতি অফিস করেন! রমনের বিজ্ঞানের প্রতি ঝোঁক ক্রমশঃ বাড়তেই থাকে। কিন্তু সে জন্য তাঁর চাকরির কাজে বিন্দুমাত্র গাফিলতি ছিল না। তাঁর বয়স অল্প হলেও তিনি অভিজ্ঞ ব্যক্তির মত শৃঙ্খলা ও দক্ষতার সঙ্গে কাজ পরিচালনা করতে পারতেন।

সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার অত্যন্ত সহৃদয় ছিল। আবার তার জন্য অসং ব্যক্তিরা তাঁর কাছ থেকে কখনো রেহাই পেত না। কেননা মিথ্যা কপটতা কিংবা কোন ভণ্ডামি রমন সহ্য করতে পারতেন না।

রেঙ্গুনে থাকাকালীন রমনের জীবনে এক দুর্যোগ নেমে আসে। তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। সেই সময় রেঙ্গুন থেকে তিনি যে চলে আসেন আর

সেখানে ফিরে যেতে হয় নি। পিতার মৃত্যুর পর কিছুদিন তিনি মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজে গবেষণা করে কাটান। তারপর আসেন নাগপুর এবং সেখান থেকে সোজা আবার কলকাতায়। এই সময় স্যার আশুতোষ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন।

স্যার আশুতোষ রমনকে পদার্থবিদ্যার পালিত অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করতে অনুরোধ করলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে যান। সরকারী চাকরিতে রমনের অনেক কিছুই সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু তিনি সে সব ছেড়ে অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করে নিলেন। তিনি ছিলেন প্রকৃতই জ্ঞানের পূজারী। তাই তাঁকে অর্থের মোহ প্রলুব্ধ করতে পারেনি।

সরাসরি অধ্যাপক পদ পাওয়া নিয়ে কিছু বাধা এলেও শেষ পর্যন্ত তা টিকে থাকেনি। রমন অধ্যাপক হয়ে নিজ গবেষণায় মনোনিবেশ করলেন এবং ছাত্রদের সেই কাজে অনুপ্রেরণা দিতে লাগলেন। এইজন্য সেই সময় ভারতের সব জায়গা থেকে পদার্থবিদ্যা অধ্যয়নের জন্য ছাত্র কলকাতায় আসতে শুরু করে। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে সায়েন্স কলেজ ও সায়েন্স এসোসিয়েশন—দু জায়গায় গবেষণা চালাতে লাগলেন।

এরপর আসে রমনের বিদেশ যাত্রার পালা। তিনি ১৯২১ খ্রী. বিলেতে যান। গবেষণার বিষয় নিয়ে বক্তৃতা দেন। বিদেশে প্রশংসাও পান। সেখান থেকে দেশে ফেরার সময় সমুদ্রের জলরাশি এবং ওপরের নীল আকাশ দেখে তিনি নীলবর্ণের ওপর গবেষণা করেন এবং সফল হন।

রমন ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস সংগঠনের খুব চেষ্টা করেন। তিনি পর পর কয়েক বছর বিজ্ঞান কংগ্রেস ও সায়েন্স এসোসিয়েশনের সম্পাদক ছিলেন। তিনি এই সময়, বহু জায়গায় গবেষণা কাজের যে একটা গুরুত্ব আছে সে বিষয়ে বক্তৃতা দেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. এস. সি. উপাধি পান। ১৯২৪ খ্রী. তিনি লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটির সভ্য মনোনীত হন।

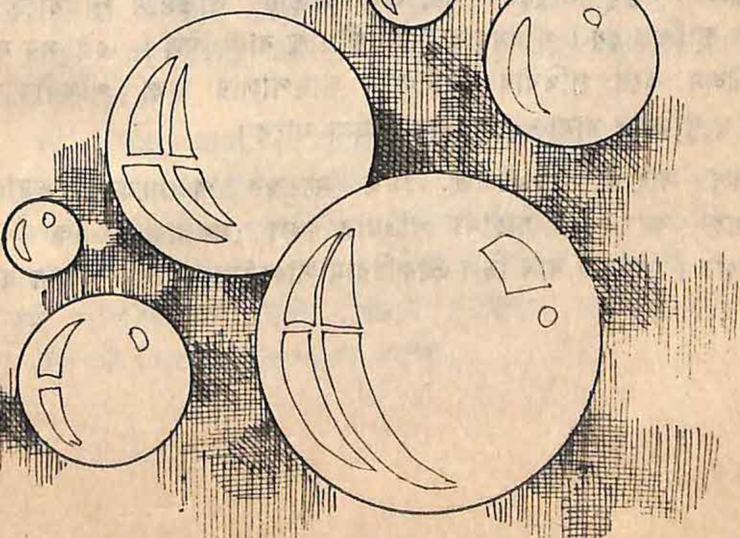
রমন পৃথিবীর বহুদেশে আমন্ত্রিত হন। প্রত্যেক জায়গায় তাঁর গবেষণার বিষয় নিয়ে বক্তৃতা করেন। তিনি সে সময় পরিভ্রমণ করেন যুক্তরাষ্ট্রের বড় বড় শহর, কানাডা, ইংল্যাণ্ড, নরওয়ে ইত্যাদি দেশ। তিনি প্রত্যেক দেশের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে শুধু যে মুগ্ধ হয়েছিলেন তাই নয়, তিনি এই সমস্তের মধ্যে গবেষণার অনেক উপাদানও পান।

যে গবেষণা কাজের জন্য রমনের খ্যাতি জগত জোড়া তা হচ্ছে, সাবানের বুদ্ বুদ্ গঠন। এই গবেষণার ফলকে বলা হয় রমন-ফল [Raman Effect]। রমনের নাম এই গবেষণার পর পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক মহলে ছড়িয়ে পড়ে।

এরপরে রমন আমন্ত্রিত হন রাশিয়া। সেখান থেকে সুইজারল্যাণ্ড ও জার্মানীর অধিংকাংশ শহর পরিদর্শন করে তিনি দেশে ফিরে আসেন। তিনি পদার্থবিদ্যার ওপর একটা মাসিক পত্রিকাও বার করেছিলেন। এই পত্রিকায় পদার্থ বিষয়ে গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করা হ'ত। রমন দেশীয় সঙ্গীতযন্ত্রের ওপরও কাজ করেন। বীণা ও মৃদঙ্গের ওপর। এই গবেষণা পত্র ছাপা হওয়ার পর তিনি প্রচুর প্রশংসা অর্জন করেছিলেন।

রমন ১৯২৯ খ্রী. মাদ্রাজ সায়েন্স কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। সেই সময় দেশে বিদেশে তিনি স্বনামধন্য। রোমের বিজ্ঞান সভা তাকে একটি স্বর্ণপদক দেয়। ভারত সরকারের কাছ থেকে পান নাইট উপাধি। ফ্যারাডে সোসাইটি পদক দিয়ে সম্মান দেখায়। এবং এর পরই ১৯৩০ খ্রী. তিনি জগতের একজন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক বলে স্বীকৃত হন। নোবেল পুরস্কার কমিটি তাঁকে নোবেল পুরস্কার দেন।

রমন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। তাঁর পুরস্কার বা কোন রকম প্রশংসার উপর তেমন লোভ ছিল না। তিনি বলতেন, যে বৈজ্ঞানিক পুরস্কার বা সম্মানের জন্য লালায়িত—তার জীবন শেষ।



বীরবল সাহানী

লক্ষ্ণৌ শহরে ১৯৪৯ খ্রী. ৩রা এপ্রিল ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হল শ্রীজওহরলাল নেহেরু প্রত্ন-উদ্ভিদবিদ্যা গবেষণা মন্দির বা পোলিও-বটানি ইনস্টিটিউট। যে বিজ্ঞানী জীবন ব্যাপী সাধনায় এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন হল তিনি বীরবল সাহানী।

বীরবল সাহানী শুধু মাত্র এই ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতাই ছিলেন না। তিনি তাঁর সমস্ত সম্পত্তি এই প্রতিষ্ঠানের জন্য দান করে দেন। সাহানীর ছিল সমস্ত পৃথিবী থেকে সংগ্রহ করে আনা এক দুষ্প্রাপ্য মূল্যবান বইয়ের গ্রন্থাগার। আর ছিল ফসিলের এক সংগ্রহ। এগুলোও তিনি ভারত ও অন্যান্য দেশ ঘুরে সংগ্রহ করেছিলেন। এই সমস্ত কিছুই তিনি ইনস্টি-টিউটের জন্য দান করে যান।

কিন্তু ভাগ্যের অদ্ভূত পরিহাস। এই ইনস্টিটিউট স্থাপনের সাত দিনের মধ্যে সাহানীর আকস্মিক মৃত্যু হয়ে যায়। খুবই শোকাবহ ঘটনা। কোনভাবেই এই অপূরণীয় ক্ষতিকে পূরণ করা সম্ভব নয়। মৃত্যুর সময় সাহানী তাঁর স্ত্রী শ্রীমতি সাবত্রীদেবীর ওপর প্রতিষ্ঠান চালানোর দায়িত্ব দিয়ে যান।

শ্রীজওহরলাল নেহেরু প্রত্ন-উদ্ভিদবিদ্যা গবেষণা মন্দির বা পোলিও-বটানি ইনস্টিটিউট শুধু ভারতেই নয়, এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান পৃথিবীতে এই প্রথম স্থাপিত হয়। গবেষণার বিষয় জীবাশ্ম বা ফসিল। এই সব ফসিল অনুশীলন করে পৃথিবীর প্রাচীনতম গাছপালার কথা, পৃথিবীর বয়স, আদিম পৃথিবীর নানা রহস্যের কথা জানা যাবে।

বীরবল সাহানী ১৮৯১ খ্রী. ১৪ই নভেম্বর পাঞ্জাবের ভেড়াগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। সাহানী পরিবার ছিল সেখানকার এক শিক্ষিত পরিবার। বাবার নাম ছিল শ্রীরুচিরাম সাহানী। তিনি ছিলেন রসায়ন

বিদ্যার অধ্যাপক। বিজ্ঞানচর্চাকে জনপ্রিয় করার জন্য রুচিরামের অবদানও কম নয়। তাঁর সজাগ দৃষ্টি ছিল যেন ভারতবাসীর কাছে বিজ্ঞান বিষয়টা সহজবোধ্য হয়ে ওঠে। তিনি এর জন্য বহু পরিশ্রমও করেছিলেন। এবং সেই একই কারণে পুত্র বীরবলের দিকে নজর রাখেন ভালভাবে। পুত্রের শিক্ষায় যেন বিন্দুমাত্র ত্রুটি না হয়।

বীরবলের বিদ্যালয় পাঠ শেষ হওয়ার পর লাহোর সরকারী কলেজে এসে ভর্তি হন। এখানে অধ্যয়নের সময় তিনি উদ্ভিদবিদ্যার স্বনামধন্য অধ্যাপক লালা শিবরাম কাশ্যপের সংস্পর্শে আসেন। এরপর ১৯১১ খ্রী. সাহানী ইংল্যাণ্ডে আসেন এবং কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। তখন তার বয়স মাত্র ২০ বৎসর। এখানে তিনি আটবছর ছিলেন। মেধাবী ছাত্র হওয়ার জন্য সাহানী বৃত্তি পেয়েছিলেন। তিনি ছিলেন উদ্ভিদবিদ্যার অধ্যাপক স্যার অ্যালবার্ট সিউয়ার্ডের প্রিয় ছাত্র। বীরবল এই গুরুর কাছ থেকে অনেক কিছু শিক্ষা পেয়েছিলেন। তারপর ১৯১৯ খ্রী. তিনি দেশে ফিরে আসেন। তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. এস. সি. ডিগ্রী পান। বীরবল সাহানী প্রথম ভারতীয় যিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. এস. সি. উপাধি পান।

দেশে ফিরে সাহানী মাত্র এক বছর পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যপক ছিলেন। তারপর থেকে তিনি আজীবন লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ছিলেন উদ্ভিদবিদ্যার ও ভূতত্ত্বের প্রধান অধ্যাপক। বীরবল সাহানীর পরিচালনায় ক্রমে ক্রমে লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ-বিদ্যার গবেষণাগার এক উচ্চশ্রেণীর অনুশীলন কেন্দ্রে পরিণত হয়।

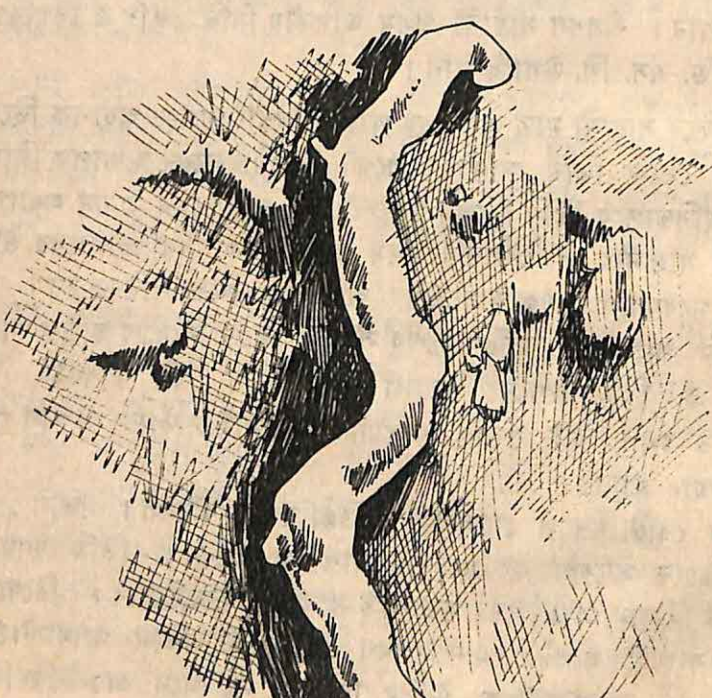
অধ্যাপক সাহানীর খ্যাতি দেশের সীমানা ছেড়ে বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৩৬ খ্রী. তিনি লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটির ষষ্ঠ ভারতীয় সভ্য মনোনীত হন। এই বছরই এশিয়াটিক সোসাইটি তাঁকে বার্কলে পদক দিয়ে সম্মান জানায়।

ইণ্ডিয়ান বোটানিক্যাল সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন বীরবল। তিনি ১৯৪০ খ্রী. ইণ্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করেন। তিনি ভারতের কয়েকটি বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের সভাপতি মনোনীত হয়েছিলেন। বিদেশেও বীরবল সাহানী যথেষ্ট সম্মান পান। ১৯৩৫ খ্রী. তিনি অ্যামস্টার্ডামে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ আন্তর্জাতিক উদ্ভিদ বিজ্ঞান সম্মেলনে প্রত্ন-উদ্ভিদবিদ্যা [পোলিও-বোটানি] শাখার সভাপতিত্ব করেন।

ভারতের পক্ষে তাঁর এই পদ পাওয়া যথেষ্ট সম্মানের। এরপরও বীরবল সাহানী আর একবার লণ্ডনে অষ্টাদশ আন্তর্জাতিক উদ্ভিদ-বিজ্ঞান সম্মেলনে যোগদান করেন। 'হিমালয়ের গাছপালার অতীত ও বর্তমান' এই পর্যায়ে কতগুলো বক্তৃতা তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দিয়েছিলেন। প্রত্যেকটি বক্তৃতাই ছিল সারগর্ভ।

দক্ষিণ এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা এই সবগুলো দেশ এক সঙ্গে মিলে বহুকোটি বৎসর পূর্বে একটি মহাদেশ ছিল। এর নাম ছিল 'গণ্ডোয়ানা ল্যাণ্ড'। অধ্যাপক সাহানী তাঁর সংগ্রহ করা ফসিলের ওপর ভিত্তি করে গণ্ডোয়ানা ল্যাণ্ডের অস্তিত্ব প্রমাণ করেছেন। তাছাড়াও রাজমহল পাহাড়ের ফসিল নিয়ে তিনি যে সব প্রবন্ধ রচনা করেছেন বৈজ্ঞানিক মহলে তার গুরুত্ব যথেষ্ট।

বীরবলের অকাল মৃত্যুতে দেশের যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে। তা না হলে এত দিনে হয়তো আরো নতুন নতুন তথ্যের সন্ধান আমরা পেতে পারতাম।



শ্রীনিবাস রামানুজম

দক্ষিণ ভারতের ইয়োদ রামানুজম এর জন্মস্থান। তিনি ১৮৮৭ খ্রী. ডিসেম্বর মাসে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁদের পরিবারে আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। পিতা ছিলেন একজন সামান্য বেতনের কেরাণী। মা ছিলেন বেলিফের কন্যা।

এত খারাপ অবস্থার মধ্যে থেকেও রামানুজম যে একজন বৈজ্ঞানিক হতে পেরেছিলেন তা সত্যি এক দৃষ্টান্তের মত। অল্প বয়েসের মধ্যেই এই বিজ্ঞানী দেশে বিদেশে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি মাত্র বেঁচেছিলেন ৩৩ বছর। এত অল্প বয়েসের মধ্যে তাঁর এই চলে যাওয়া—একটি সত্যিকারের দুর্ঘটনা। ভারতবর্ষের অপরিমেয় ক্ষতি।

রামানুজম অঙ্ক শাস্ত্রে তাঁর প্রতিভার জন্য মাতা পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে কিছুই পান নি। তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা পান কুম্ভ-কোনমের টাউন স্কুলে। তিনি স্কুলে অধ্যয়নের সময় শান্তপ্রকৃতির ও চিন্তাশীল ছিলেন। সে সময় থেকেই তিনি কঠিন অঙ্কের সমাধান করতে পারতেন। বারো বছর বয়েসে তিনি সবাইকে মোটামুটি অবাক করে দেন। কারো সাহায্য ছাড়াই রামানুজম লোনির ত্রিকোণমিতির অঙ্ক-গুলো কষে দিতে পারতেন। এরপর তিন বছর পর তিনি আরো উচ্চ পর্যায়ের অঙ্কশাস্ত্র নিয়ে সহজেই আলোচনা করতে পারতেন।

রামানুজমের ধ্যান জ্ঞান শুধু অঙ্কই ছিল। তাই তিনি অন্য কোন বিষয়ে তেমন পারদর্শি ছিলেন না। কিন্তু এই জন্য তার সতের বছর বয়সে কুম্ভকোনমের সরকারী কলেজে একটি বৃত্তি লাভ করেও তিনি সে বৃত্তি পাননি। ভালভাবে ইংরেজী না জানার জন্য তিনি সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন। এরপর আর্থিক অভাবের জন্য কলেজের পড়া ছেড়ে জীবিকার অন্বেষণে বেরিয়ে পড়তে হয়। বহুদূরের ছোট এক শহরে সাময়িকভাবে

তাঁর চাকরি জোটে। এখানে তাঁকে প্রচুর পরিশ্রম করতে হতে। অথচ তেমন খাদ্যের সুযোগ ছিলনা। তাই কিছুদিনের মধ্যে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে। কিন্তু তাঁর অঙ্কশাস্ত্রের প্রতি ভালবাসা তেমনি অটুট ছিল। তিনি নিয়মিত এই শাস্ত্র নিয়ে চর্চা করতে ভুলতেন না।

সেই সময় রামানুজমের সঙ্গে বিখ্যাত অঙ্কশাস্ত্রবিদ্ রামচন্দ্র রাও-এর সঙ্গে পরিচয় হয়। তিনি এই প্রতিভাধরকে সহজেই চিনে নিতে পারেন। এবং যেন অর্থের অভাবে ধ্বংস না হয়ে যায়, সে কথা ভেবে রামচন্দ্র রাও মাদ্রাজ কোর্ট ট্রাস্টের সভাপতিকে একটি পরিচয় পত্র দিয়ে লেখেন, এরকম একটি প্রতিভাকে এভাবে ধ্বংস হতে দেওয়া কখনোই উচিত নয়।

সাহেব সভাপতি মহাশয় রামানুজমকে মাদ্রাজ কোর্ট ট্রাস্টে একটি চাকরির ব্যবস্থা করে দেন। তিনি এই তরুণ অঙ্কশাস্ত্রবিদ্‌কে লক্ষ্য রাখতেন। এক সময় তিনি রামানুজমের গবেষণার প্রবন্ধগুলো ডাক্তার ওয়াকার নামে এক বৈজ্ঞানিককে দেখান। তিনি তাঁর গবেষণায় মুগ্ধ হয়ে যান এবং মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেন যেন তারা রামানুজমকে এমন সাহায্য করেন যাতে তাকে জীবিকার জন্য না ভেবে গবেষণা কার্যে নিযুক্ত থাকতে পারে।

মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় রামানুজনকে সে সুযোগ করে দেয়। তাঁকে মাসিক ৭৫ টাকা বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এই সময় রামানুজম ছিলেন নিরুদ্বেগ, তাই ভালভাবে তাঁর গবেষণাকার্য চলতে থাকে। কিছুদিন পর রামানুজমের গবেষণা প্রবন্ধ কেমব্রিজের বিখ্যাত অধ্যাপক হার্ডির কাছে পাঠানো হয়। তিনি এই অসাধারণ মৌলিক কাজ দেখে মুগ্ধ হন। তিনি রামানুজমকে কেমব্রিজে যেয়ে আরো উঁচু ধরনের গবেষণা করার জন্য আমন্ত্রণ জানান। রামানুজমের জীবনে এ এক দারুন সংবাদ। কিন্তু তিনি বিদেশ যেতে অসম্মত হন। কারণ দেখান তিনি গোঁড়া ব্রাহ্মণ।

এরপর ১৯১৪ খ্রী. কেমব্রিজের অধ্যাপক মিঃ নেভিল ভারত ভ্রমণে এলে রামানুজমের সঙ্গে দেখা করে তাকে কেমব্রিজ যাওয়ার জন্য আবার অনুরোধ করেন। তিনি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি চিঠি দিয়ে জানান, রামানুজমের প্রতিভার আবিষ্কার আমাদের বর্তমান গণিতশাস্ত্রের জগতে একটি সর্বপ্রধান ঘটনা।···গণিতের ইতিহাসে নাম অক্ষয় হয়ে থাকবে।

মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় তাকে দু বছরের জন্য বছরে ২৫০ পাউণ্ডের এক বৃত্তি দেয়। পরে রামানুজম বিলেতে যান এবং সেখানে যেয়ে এর উপকারিতা উপলব্ধি করেন। তিনি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজে ভর্তি হন এবং অধ্যাপক হার্ডির পরিচালনায় গবেষণা করেন। এই বিশ্ববিদ্যালয় তাকে দেয় ৬০ পাউণ্ডের বৃত্তি।

রামানুজম মাছ মাংস স্পর্শ করতেন না। কিন্তু শীতপ্রধান দেশে মাছ মাংস না খেলে স্বাস্থ্যরক্ষা করা অসম্ভব। সেইজন্য ইংল্যাণ্ডে যেয়ে রামানুজমের স্বাস্থ্য ভেঙ্গে যায়। তিনি কিছুদিনের মধ্যেই যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হন। শরীর দারুণ ভাবে নষ্ট হওয়ার জন্য তাকে স্যানিটোরিয়ামে থাকতে হয়।

এর মধ্যে রামানুজমের খ্যাতি বৈজ্ঞানিক জগতে ছড়িয়ে পড়ে। ১৯১৮ খ্রী. তিনি এফ. আর. এস. বা রয়্যাল সোসাইটির ফেলো মনোনীত হন। একজন বৈজ্ঞানিকের পক্ষে এই পদ পাওয়া খুবই সম্মানের। তিনিই রয়্যাল সোসাইটির ইতিহাসে সর্বকনিষ্ঠ এফ. আর; এস.।

এই সম্মানে উৎসাহিত হয়ে রামানুজম ভাঙা স্বাস্থ্য নিয়ে আবার গবেষণার কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। সেই বছরই তাঁকে কেমব্রিজের ট্রিনটি কলেজের ফেলো নির্বাচিত করা হয় এবং তখন থেকে তাঁর বৃত্তির অঙ্ক বেড়ে দাঁড়ায় ২৫০ পাউণ্ড।

এই সব সম্মান পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রামানুজম দেশে ফিরতে পারলেন না। কারণ তখন প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধ চলছে। জাহাজে করে ফেরা মোটেও নিরাপদ নয়। যুদ্ধ শেষে ১৯১৯ খ্রী. তিনি বোম্বাই পৌঁছান। ততদিনে তাঁর স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে গেছে। জীবনীশক্তি প্রায় শেষ। তবু জীবনের সঙ্গে যুদ্ধ করে সেই অঙ্কশাস্ত্রবিদ বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী ১৯২০ খ্রী. এপ্রিল মাসে শেষ নিশ্বাস ত্যার্গ করলেন।

রামানুজম আরো কিছুদিন বাঁচলে নিশ্চয়ই এই পৃথিবীকে গণিতের ব্যাপারে আরো নতুন নতুন তথ্য দিয়ে যেতে পাড়তেন। এটা পৃথিবী তথা ভারতের পক্ষে এক বিরাট ক্ষতি।

উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী

উপেন্দ্রনাথের জন্ম হয় ১৮৭৫ খ্রী. ৭ই জুন জামালপুরে। ছোটবেলা থেকেই তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। পরীক্ষায় ভাল ফল করার জন্য তিনি বহু পদক ও বৃত্তি লাভ করেন। উপেন্দ্রনাথ বি. এ. পাশ করেন হুগলী কলেজ থেকে। গণিতে তাঁর অনার্স ছিল। তাই নিয়ে তিনি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন।

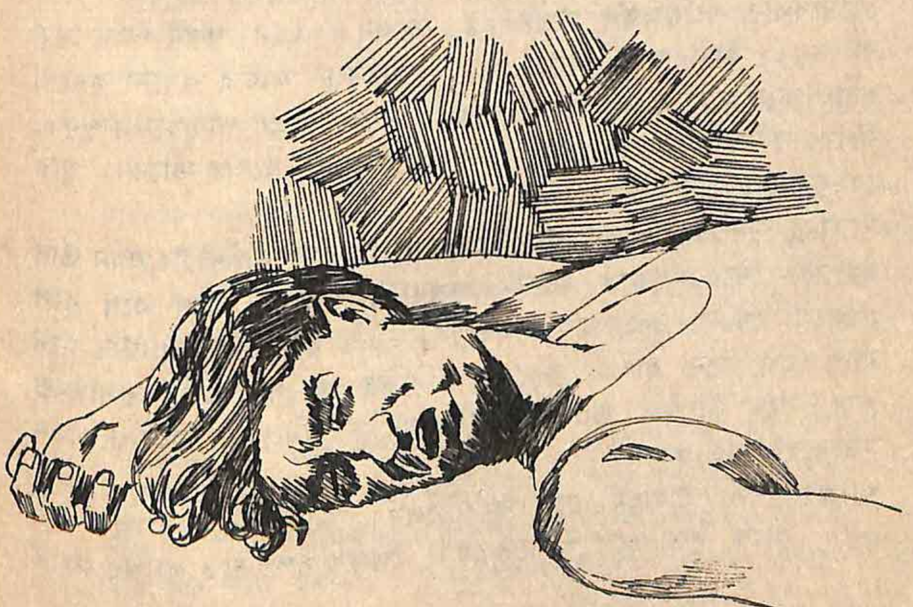
এরপর তিনি চিকিৎসাশাস্ত্র ও রসায়নশাস্ত্র একই সঙ্গে অধ্যায়ন করতে শুরু করেন। প্রথমে তিনি পাশ করেন এম. বি.। মেডিসিন ও সার্জারিতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। তাঁকে সম্মান জানানো হয় গুডফি ও ম্যাকলিওড পদক দিয়ে। তিনি ১৯০২ খ্রী. এম. ডি. এবং ১৯০৪ খ্রী. ফিজিওলজিতে পি. এইচ. ডি উপাধি পান। এছাড়াও উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী পেয়েছিলেন—কোটস্ মেডেল, গ্রিফিথ প্রাইজ, মিন্টো মেডেল ইত্যাদি বহু পুরস্কার। ডাঃ ব্রহ্মচারীর চাকরী জীবন শুরু হয় ঢাকা মেডিক্যাল স্কুলে। এখানে তিনি প্যাথলজি ও মেটিরিয়া মেডিকার শিক্ষক নিযুক্ত হন। এরপর আসেন কলিকাতা ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলে [যার বর্তমান নাম স্যার নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ]। তিনি এখানে ছিলেন মেডিসিনের শিক্ষক হয়ে। ডাঃ ব্রহ্মচারী একনাগাড়ে এখানে কুড়ি বৎসর চাকরি করেন। একই পদে তিনি কুড়ি বছর কাটান।

এই মেডিক্যাল স্কুলে তিনি কালাজ্বর সম্বন্ধে অধিকাংশ গবেষণা এবং জগদ্বিখ্যাত ওষুধ 'ইউরিয়া স্টিবামিন' আবিষ্কার করেন। এছাড়া ম্যালেরিয়া, ব্ল্যাক ওয়াটার ফিভার প্রভৃতি গ্রীষ্মপ্রধান দেশের রোগ নিয়ে বহু গবেষণা করেন। রসায়নশাস্ত্রেও তাঁর প্রচুর গবেষণা পত্র আছে। তাঁর রচিত 'এ ট্রিটিজ অন কালাজ্বর' একটি বিখ্যাত গ্রন্থ। জার্মান চিকিৎসাবিদ ডাঃ কার্লমেনস-এর গ্রন্থে কালাজ্বর অধ্যায়টি তাঁরই রচিত। এই

জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের নাম মানুষের মনে চিরকালের জন্য গাঁথা থাকবে। তিনি কালাজ্বর ব্যাধির নিদান আবিষ্কার করে মানব সভ্যতার অভূতপূর্ব কল্যাণসাধন করেছেন। বিশেষ করে সেই সময় আসাম ও বাংলায় কালাজ্বর একটি ভীষণ বীভিষিকাময় অসুখ ছিল। এই হলে কেউ আর প্রাণ ফিরে পেতনা ডাঃ উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী সেদিন এই অসাধ্য সাধন করতে পেরেছিলেন।

তাঁর এই ইউরিয়া স্টিবামিন আবিষ্কার করার আগে হাজার হাজার মানুষ রোগগ্রস্ত হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন। গ্রামকে গ্রাম মানুষ, মহল্লা থেকে মহল্লা উজাড় হয়ে গেছে কয়েকদিনের মধ্যে। সে এক অবর্ণনীয় দৃশ্য।

তৎকালীন ভারত সরকার উপেন্দ্রনাথকে তাঁর আবিষ্কারের জন্য সম্মানিত করেন। তাঁকে নাইট উপাধি দেন। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন রকম বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন। ইন্দোরে ১৯৩৬ খ্রী. ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের যে অধিবেশনে হয় তাতে উপেন্দ্রনাথ সভাপতিত্ব করেন। এবং তিনি ছিলেন রয়্যাল সোসাইটি অফ মেডিসিন-এর সভ্য।



শান্তিস্বরূপ ভাটনগর

ভারতে বিজ্ঞানের ইতিহাসে শান্তিস্বরূপ ভাটনগর একটি অনন্য নাম। তিনি বিজ্ঞান অনুশীলনের জন্য যত কাজ করে গেছেন একজন মানুষের জীবনে সেই কাজ সত্যি কল্পনাতীত! সম্ভবতঃ বিজ্ঞান বিবর্তনের ইতিহাসে এ এক অভূতপূর্ব কাজ। তাঁর সম্পর্কে পৃথিবীর বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক বিভিন্ন অভিমত প্রকাশ করে গেছেন।

শান্তিস্বরূপ জন্মগ্রহণ করেন পাঞ্জাবের শাপুর জেলার ভেড়া গ্রামে। সেদিনটি ছিল ৩১শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৪ খ্রী.। খুব ছোট বয়েসেই তিনি পিতাকে হারান। তাই ছোটবেলা কাটে মাতামহ মুন্সী পিয়ারীলালের সঙ্গে। মাতামহ বাস করতেন সিকন্দ্রাবাদে। এখানে ছোটবেলায় শান্তিস্বরূপের লেখাপড়া শুরু হয়। পরে স্কুলের পাঠ শেষ করে তিনি লাহোরে এসে কলেজে ভর্তি হন।

ছোটবেলায় শান্তিস্বরূপ যথেষ্ট দুষ্টু ছিলেন। যখন তখন গাছে চড়ে বসতেন। কাঁচা আম পেড়ে পেড়ে খেতেন। আবার কখনো কখনো হঠাৎ করে জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়তেন। সাঁতরে দিয়ে পার হতেন পুকুর, কিংবা নদীর জলে ডুব দিতেন, সাঁতার কাটতেন যথেচ্ছ ভাবে। ঘুরে বেড়াতেন এখানে সেখানে।

মাতামহ মুন্সীজী ছিলেন ইঞ্জিনীয়ার। ঘরে বসে ইঞ্জিনীয়ার যখন তাঁর যন্ত্রপাতি নিয়ে আঁকতে বসতেন, তখন শান্তিস্বরূপ পাশে বসে বসে সেগুলো খেয়াল করতেন ভালভাবে। এই যন্ত্রপাতিগুলো তাঁর মনে নানা প্রশ্ন এনে হাজির করতো। বিভিন্ন সে সব প্রশ্ন অনুসন্ধিৎসু করে তুলতো তাঁকে। শান্তিস্বরূপ বিস্ময়ের দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে দেখতেন মতামহের কাজ করা।

শান্তির পিতা ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তাই তাঁর পিতামহর কাছ থেকে তাকে দূরে চলে আসতে হয়। পৈতৃক সম্পত্তিতে শান্তির কোন

অধিকারও ছিল না, এমনকি পিতৃবংশীয়দের স্নেহ থেকেও তিনি বঞ্চিত হয়েছিলেন। বাবা পরমেশ্বরী সহায় ছিলেন সামান্য বেতনের শিক্ষক। তাই তিনি তেমন কিছু রেখে যেতে পারেন নি স্ত্রী পুত্রের জন্য। এদিকে লাহোরে মাতামহের অবস্থাও তেমন সচ্ছল ছিল না। তাই প্রথম প্রথম শান্তিকে একটু অসুবিধেয় পড়তে হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে অসুবিধে আর থাকে নি। তিনি প্রতিযোগিতা পরীক্ষা দিয়ে ছাত্র বৃত্তি লাভ করেন। তা ছাড়াও অবসর সময় ছাত্র পড়িয়ে এবং কলেজে ডিমনস্ট্রেটারী করে নিজের পড়ার খরচ নিজেই চালিয়ে নিতেন। ১৯১৯ খ্রী. লাহোর কলেজ থেকে এম. এস. সি. পাশ করার পর বিদেশে পড়ার জন্য শান্তিস্বরূপ দয়াল সিং বৃত্তি পান। এরপর লণ্ডনে গবেষণা করে তিনি ডি. এস. সি. ডিগ্রী পান। সেখানে শিক্ষাগুরু আচার্য ডনান শান্তিকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন।

ছোটবেলা থেকেই শান্তি ভাবতে শুরু করেন, শুধুমাত্র জ্ঞানার্জনই শেষ কথা নয়। জ্ঞানকে কার্যকর করে মানুষের কাজে না লাগাতে পারলে জ্ঞানের কোনই মূল্য থাকে না। তাই তিনি পরবর্তী জীবনে দেশের সম্পদকে ভালভাবে যেন জনসেবায় নিয়োজিত করা যায় সেদিকে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। এবং এ সমস্ত কাজ ভালভাবে আয়ত্ত করার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যেয়ে কর্মধারার সঙ্গে পরিচিত হন। ফ্রান্স ও জার্মানীতে গিয়েছিলেন দুবার। আর তিনি যখন ইংল্যাণ্ডে ছিলেন সেখানকার সায়েন্টিফিক ও ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ ফাণ্ড থেকে সাহায্য পান। এরপর শান্তিস্বরূপ দেশে ফিরে মদনমোহন মালব্যজীর আমন্ত্রণে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়নের অধ্যাপক হয়ে যোগদান করেন। এটাই বিজ্ঞান-বীজ রোপনের তাঁর প্রথম ক্ষেত্র। এবং এই হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি রসায়নশাস্ত্রের বিভিন্ন শাখায় গবেষণা আরম্ভ করেন। শান্তিস্বরূপের বহু শিষ্যও জোটে এখানে।

পরের বিজ্ঞান-বীজ রোপনের ক্ষেত্র লাহোর কলেজ। এখানেও তিনি রসায়ন শাস্ত্রের বিভিন্ন শাখায় গবেষণায় নিযুক্ত হন। তবে এখানে তিনি শুধু গবেষণাই করতেন না। ফলিত রাসায়নিক শিল্পের নানা সমস্যা সমাধান নিয়ে কাজ করতেন। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু অর্থ উপার্জনও হত। ১৯২৮ খ্রী. চৌম্বক রসায়ন সম্বন্ধে গবেষণা করে তিনি বিশ্বখ্যাতি অর্জন করেন। এই সময় একটি ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠান আটকে তেলের

সন্ধান করছিল। কিন্তু আটকে মাটির নিচে লবণ থাকায় যন্ত্রগুলো মাটির স্তর ভেদ করে বেশি দূর যেতে পারছিল না।

ড: ভাটনগর এই সমস্যার সমাধান করতে পেরেছিলেন। ফলে সেই প্রতিষ্ঠান তাকে দেড় লক্ষ টাকা পুরস্কার দিতে চাইলে তিনি সেই অর্থ নিজে না নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়কে পাইয়ে দেন। সেই টাকা দিয়ে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে পেট্রোলিয়াম গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি পর পর বহু রসায়ন শিল্পের সমস্যা সমাধান করেন। এরপর ১৯:৮ খ্রী. সায়েন্স কংগ্রেসের রসায়ন শাখার সভাপতি মনোনীত হন।

ড: ভাটনগর সায়েন্টিফিক অ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চের ডিরেক্টার নিযুক্ত হন। এই সময়ে তিনি বহু সম্মানে ভূষিত হয়েছিলেন। স্যার উপাধি পান ১৯৪১ খ্রী.। ১৯৪৩ খ্রী. নির্বাচিত হন রয়্যাল সোসাইটির ফেলো এবং ১৯৪৫ খ্রী. সভাপতি নির্বাচিত হন ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের। তাঁর রচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থের নাম 'চৌম্বক রসায়ন।'

মানুষ ভাটনগর ছিলেন তুলনাহীন। তাঁর আদর্শ ছিল উঁচু। লোভ ছিল না কোন কিছুতে। সাধারণ মানুষের সঙ্গে সুন্দর ভাবে মিশতে পারা তাঁর অন্যতম গুণ ছিল। তিনি একাধারে যেমন বৈজ্ঞানিক ছিলেন তেমনি তিনি একজন ছিলেন সাহিত্যিক ও কবি। উর্দু ভাষায় তিনি বহু কবিতা রচনা করেন। ভাটনগর উর্দুতে একখানি নাটকও রচনা করেছিলেন। নাটকটির নাম 'কেরামতি'। এ ছাড়াও তিনি একজন সুবক্তা ছিলেন।

ভারতের বিজ্ঞানের নবজাগরণের ইতিহাসে ভাটনগরের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি ভারতে জাতীয় গবেষণাশালা প্রতিষ্ঠা। প্রায় তেরটি জাতীয় গবেষণাশালা তিনি প্রতিষ্ঠা করেন। ভারত সরকার এই গবেষণাশালা প্রতিষ্ঠার ব্যয়ভার গ্রহণ করেন।

দেশ বিদেশ থেকে বিভিন্ন সময় ভিন্ন ভিন্ন বৈজ্ঞানিক এখানে আসেন এবং দেশের সম্পদকে জনকল্যাণের কাজে ব্যবহার করার উপায় স্থির করে দেন। শান্তিস্বরূপ ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদ ও গবেষণা-শালা সমূহের কি ধরনের কাজ হচ্ছে তা জানানোর জন্য একটি বই প্রকাশ করেন। নাম: 'ওয়েলথ অফ ইণ্ডিয়া'। এই সব গবেষণাগারে যে সব বিদ্যা নিয়ে গবেষণা করা হয় তা হচ্ছেঃ রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, কাঁচশিল্প, জ্বালানী শিল্প, ধাতববিদ্যা।

১৯৫৫ খ্রী. ৩রা জানুয়ারী ডঃ ভাটনগর পৃথিবী থেকে চির বিদায় নেন। তাঁর কর্মময় জীবনে ছেদ পড়ে যায়।

সত্যেন্দ্রনাথ বসু

বিশ্ববিজ্ঞানের ইতিহাসে যে কোনও দশজন শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীর মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথের নাম অবশ্যই উচ্চারিত হবে। আমাদের একান্ত গৌরবের বিষয় আচার্য সতেন্দ্রনাথ পরাধীন ভারতবর্ষেই জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি বাঙালি সমাজের বরণীয় সন্তান।

সতেন্দ্রনাথের পূর্বপুরুষের আদি বাসস্থান ছিল কাঁচপাড়ার কাছাকাছি পল্লী পরিবেশে। কলকাতার গোয়াবাগানেও তাঁদের বাড়ি ছিল। সতেন্দ্রনাথ গোয়াবাগানে ১৮৯৪ খ্রী. ১লা জানুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন। গাঁয়ে তখন ভীষণ রকমের ম্যালেরিয়া মহামারী। তাই বাড়ির সবাই এসে বাসা বাঁধলেন কলকাতায়। পিতামহ ছিলেন সরকারী চাকুরে। তাঁর অকাল মৃত্যু ঘটলে সংসারের সব দায়দায়িত্ব এসে পড়ে সত্যেন্দ্রনাথের পিতা সুরেন্দ্রনাথ বসুর ওপর। তিনিও ছিলেন সরকারী চাকুরিজীবি। তিনি ছিলেন রেল বিভাগের কর্মচারী। পরে তিনি বাংলাদেশে সর্বপ্রথম কেমিক্যাল ওয়ার্কস প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

সত্যেন্দ্রনাথ খুব কম বয়েসে পড়াশোনা আরম্ভ করেন। প্রথমে কয়েকটা স্কুলে লেখাপড়া করে তারপর তিনি হিন্দু স্কুলে ভর্তি হন। ১৯০৮ খ্রী. তাঁর এন্ট্রান্স পরীক্ষা দেবার কথা। কিন্তু পরীক্ষা দেবার নির্ধারিত বয়েসে পৌঁছান নি বলে তার পরের বছর তাঁকে এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিতে হয়েছিল। এই পরীক্ষায় তিনি পঞ্চম স্থান অধিকার করে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। তারপর তিনি ভর্তি হয়েছেন প্রেসিডেন্সি কলেজে। এখান থেকে সত্যেন্দ্রনাথ এফ. এ., বি. এ. ও এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং প্রত্যেক পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। ছাত্রজীবনে অসাধারণ মেধা ও প্রতিভার তীক্ষ্ণতায় তিনি শিক্ষকদের বিস্মিত করেছিলেন।

সেই সময় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। তাঁর বিদ্যোৎসাহিতার তুলনা নেই। তিনি সত্যেন্দ্রনাথ আর

সতীর্থদের ডেকে বললেন তাঁর এক নতুন অভিপ্রায়ের কথা। বিজ্ঞান কলেজে তিনি পদার্থবিদ্যা বিভাগ খুলতে চান। কিন্তু পদার্থবিদ্যায় অধ্যাপনা করবেন কারা? তিনি একবছরের জন্য স্কলারশিপের ব্যবস্থা করতেও রাজী। কিন্তু ঐ সময়ের মধ্যে স্কলারশিপ প্রাপকদের পদার্থ-বিদ্যার অধ্যাপনায় উপযোগী হয়ে উঠতে হবে। কে এই ভার নিতে এগিয়ে আসবে?

সত্যেন্দ্রনাথ স্যার আশুতোষের প্রস্তাবে রাজী হলেন। তিনি বিজ্ঞান কলেজের আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্রের রসায়ন বিভাগের পাশাপাশি আর একটি নতুন বিভাগ খুললেন—সম্পূর্ণটুকুই তাঁর নিজের হাতে। শুরু হল পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ। বছর পাঁছেক সত্যেন্দ্রনাথ এই নতুন বিভাগটির পরিচালনায়, গবেষণার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এরপর তিনি ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করলেন। এই বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে গবেষণার জন্য বিদেশে পাঠায়। ইয়োরোপে যাত্রার কিছুদিন আগে ১৯২৪ খ্রী. সত্যেন্দ্রনাথের একটি গবেষণা পত্র জার্মান ভাষায় অনূদিত হয় এবং সেখানকার বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে বিদেশের বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

সমকালীন শ্রেষ্ঠতম বিজ্ঞান সাধক আইনস্টাইন সত্যেন্দ্রনাথের গবেষণা পত্রটি পড়ে তাঁকে অভিনন্দিত করেছেন। বস্তুত পক্ষে সত্যেন্দ্রনাথ গবে-ষণাপত্রের একটি অনুলিপি আইনস্টাইনের কাছে পাঠিয়েছিলেন। আর আইনস্টাইন নিজেই সেটিকে জার্মান ভাষায় অনুবাদ করেন এবং সেই সঙ্গে নিজের মতামত যুক্ত করে দিয়েছিলেন। পূর্বপ্রচলিত বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তকে পরিবর্তিত করে একইভাবেই বিজ্ঞান জগতে আর একটি অভিনব আবিষ্কার সংযোজিত হল। বোস-আইনস্টাইন সংখ্যায়ন বা বোস-সংখ্যায়ন।

সতেন্দ্রনাথের যে গবেষণার জন্য এত খ্যাতি, তা অত্যন্ত জটিল। প্রত্যেক পদার্থ অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণা দিয়ে গঠিত। একে বলে পরমাণু। আবার পরমাণু আরও সূক্ষ্মতর কণাসমূহ দিয়ে গঠিত। একে বলে ইলেকট্রন, প্রোটন প্রভৃতি। পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রনগুলো অতি দ্রুত গতিতে ঘুড়ে বেড়ায়। কিন্তু এই গতিবেগ সাধারণ নিয়ম মাফিক চলে না। সত্যেন্দ্রনাথই প্রথম এই নিয়ম মাফিক গতিবেগের নতুন সূত্র আবিষ্কার করেন। এই পরিসংখ্যান নিয়মের উপর ভিত্তি করে আধুনিক পদার্থ-বিজ্ঞানের সৌধ নির্মিত হয়েছে।

সত্যেন্দ্রনাথ ফ্রান্সে উপস্থিত হয়ে মনীষী সিলভাঁ লেভির সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। পরে দেখা করেছেন বিজ্ঞানী ম্যাডাম কুরীর সঙ্গে। তারপর তিনি আসেন জার্মানীতে। দেখা হয় আইনস্টাইনের সঙ্গে। তাঁর দীর্ঘ দিনের বাসনা পূর্ণ হল। বিদেশে ভ্রমণ শেষ করে সত্যেন্দ্রনাথ আবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে এলেন। পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের রীডার থেকে বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপকের পদে উন্নীত হলেন। ১৯২৯ থেকে ১৯৪৫ খ্রী. পর্যন্ত তিনি দীর্ঘ পঁচিশ বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন। এরপর তিনি চলে আসেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। এখানে এসে তিনি যোগদান করলেন খয়রা অধ্যাপক হিসেবে। ১৯৪৪ খ্রী. তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সাধারণ সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫০ খ্রী. পর্যন্ত তিনি ভারতের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স এবং সভাপতি পদে নিযুক্ত হন। পরে তিনি বিদেশে বৈজ্ঞানিক গবেষণা সংক্রান্ত কাজে বেশ কয়েকবার গিয়েছিলেন। ভারত সরকার সতেন্দ্রনাথকে ১৯৫৪ খ্রী. পদ্মবিভূষণ উপাধিতে ভূষিত করেন।

মানুষ হিসাবে সত্যেন্দ্রনাথ অত্যন্ত অমায়িক ও বিনয়ী। তাঁর সৌজন্য ও দরদী মন সকলকেই মুগ্ধ করে। তিনি সকল বিষয়েই অনাড়ম্বর জীবন যাপন করেন: হাফ সার্ট, ধুতি ও স্যাণ্ডেল—এই ছিল তাঁর সাধারণ পোশাক।

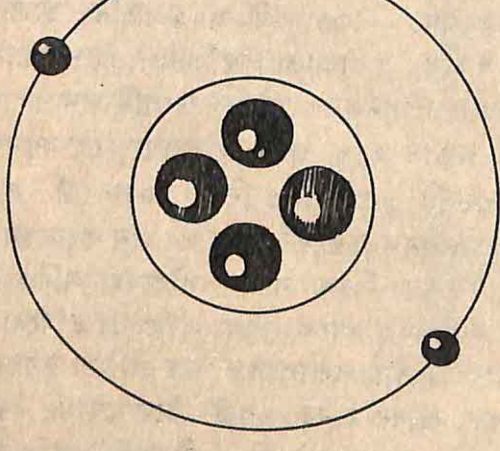
সত্যেন্দ্রনাথের কর্মময় জীবন শুধু অধ্যয়ন-অধ্যাপনার গণ্ডির মধ্যেই আবদ্ধ থাকেনি। ১৯৫৬ থেকে ১৯৬৮ খ্রী. পর্যন্ত তিনি ছিলেন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে আচার্য সত্যেন্দ্রনাথকে সম্মানজনক ডক্টরেট উপাধি দান করা হয়। অধ্যাপনাই ছিল আচার্য বসুর জীবন সাধনা। এই বন্ধন থেকে তিনি কোনদিন মুক্তি পাননি এবং চানও নি। ১৯৫৮ খ্রী. যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানজনক ডক্টরেট উপাধি দান করেছেন। ঐ বছরই তিনি আরো দুটি বিশেষ বিরল সম্মান-গৌরবের অধিকারী হয়েছেন। ইংল্যাণ্ডের রয়্যাল সোসাইটি তাঁকে ফেলো অর্থাৎ সদস্য মনোনীত করলেন, ভারত সরকার তাঁকে জাতীয় অধ্যাপকের পদে প্রতিষ্ঠা করেন।

এই বিজ্ঞানসাধকের জীবন-মনের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য—তিনি ছিলেন সাহিত্যপ্রাণ। প্রমথ চৌধুরী [বীরবল] প্রতিষ্ঠিত সবুজপত্র গোষ্ঠির সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। এই সাধকের জীবনের

এক বিশেষ আগ্রহ ছিল, মাতৃভাষার-মাধ্যমে বিজ্ঞান অনুশীলিত হোক। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে কোন বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা মাতৃভাষার মাধ্যমে যতটা সহজ আর কোন উপায়ে তা সম্ভব নয়। সত্যেন্দ্রনাথ নানা ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। জার্মাণ, ফরাসী, ল্যাটিন, ইংরেজ, হিব্রুভাষায় তাঁর দক্ষতা ছিল যথেষ্ট। হিব্রুভাষায় রচিত মূল গল্প থেকে তিনি বাংলায় অনুবাদও করেছেন।

আইনস্টাইনকে তিনি গুরুর মর্যাদা দান করেছেন। বিজ্ঞানসাধক সত্যেন্দ্রনাথ আশ্চর্য নিপুণ বেহালা বাজাতে জানতেন। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ। বাঙলা ভাষায় 'জ্ঞান-বিজ্ঞান' নামে বিজ্ঞান-বিষয়ক পত্রিকা তাঁরই প্রতিষ্ঠিত। বিশ্ব বিখ্যাত এই বিজ্ঞানী সরল সহজ অনাড়ম্বর জীবন যাপন করেছেন। ব্যক্তিত্ব-দৃঢ়তাও তাঁর অসাধারণ। কোনরকম অসঙ্গতি-অন্যায়ের সঙ্গে তিনি কোনদিনই সন্ধি করেন নি।

১৯৭৪ খ্রী. ৪ঠা ফেব্রুয়ারী বিশ্ববিখ্যাত এই বিজ্ঞানীর মহাপ্রয়াণ ঘটে। বাঙলাদেশ, ভারতবর্ষ হারিয়েছে তাঁর এক সুযোগ্য সন্তান, পৃথিবী হারায় শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানসাধককে।



মেঘনাদ সাহা

ঢাকা জেলার সেওড়াতলী গ্রামে ১৮৯৩ খ্রী. মেঘনাদ জন্মগ্রহণ করেন। পিতা জগন্নাথ সাহা গ্রামে সামান্য ব্যবসা করতেন। ছোটবেলায় মেঘনাদকে খুব অভাব অনটনের মধ্যে কাটাতে হয়। তিনি প্রথমে গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন। তারপর তিনি পড়তে যান গ্রাম থেকে সাত মাইল দূরে শিমুলিয়ায়। সেখানে তিনি মধ্য-ইংরেজী বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। এতদূর থেকে বিদ্যালয়ে যাওয়া আসা করা খুবই অসুবিধে। আবার বাড়ির অবস্থাও এমন নয় খরচ দিয়ে স্কুলের কাছাকাছি কোথাও রাখা। কিন্তু সেই সময় মেঘনাদের একটি আশ্রয় জুটে যায় ভাগ্যক্রমে।

এই আশ্রয়দাতার নাম শিমুলিয়া গ্রামের একজন ডাক্তার অনন্তকুমার দাস। তাঁর বাড়িতে বিনা খরচে মেঘনাদের থাকার ও খাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। ১৯০৫ খ্রী. মেঘনাদ এই বিদ্যালয় থেকে ঢাকা বিভাগের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে বৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। মাসিক বৃত্তি মেলে ৪ টাকা করে। এই বৃত্তি পাওয়ায় মেঘনাদের পড়াশোনার খুব সুবিধে হয়।

এরপর মেঘনাদ ঢাকায় এসে কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হন। কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্য তিনি এই স্কুল থেকে বিতাড়িত হন। এসে ভর্তি হন ঢাকা জুবিলী স্কুলে। এই সময় তিনি ব্যাপটিস্ট মিশনের বাইবেল পরীক্ষা দিয়ে বাংলায় প্রথম হয়ে একশ টাকা পুরস্কার পান। মেঘনাদ এই স্কুল থেকে এণ্টান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় তিনি তৃতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন এবং ইংরেজী, বাংলা ও সংস্কৃতে তিনি প্রথম স্থান পাওয়ার জন্য মাসিক বৃত্তি পাওয়ার অধিকারী হন। এই বৃত্তির মূল্য ছিল মাসিক কুড়ি টাকা।

মেঘনাদ আই. এস. সি. পাশ করেন ঢাকা কলেজ থেকে। এই পরীক্ষায় পাশ করার পর মাসিক বৃত্তি পান ২৫ টাকা। সেই সময় তিনি জার্মাণ ভাষা অধ্যয়ন করেন। এরপর মেঘনাদ চলে আসেন কলকাতায়। ভর্তি হন প্রেসিডেন্সী কলেজে। বি. এস. সি., এম. এস. সি. এখান থেকেই পাশ করেন। প্রত্যেক পরীক্ষায়ই তাঁর ফল ছিল দ্বিতীয় স্থান। এ সময় মেঘনাদের সতীর্থ যাঁরা ছিলেন তাঁরা প্রত্যেকেই এক একজন দিকপাল। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখার্জী। মেঘনাদ ও সত্যেন্দ্রনাথের মধ্যে প্রত্যেক পরীক্ষায় রীতিমত প্রতিযোগিতা চলত।

ছাত্রজীবনে মেঘনাদ অনেক বিপ্লবীর সংস্পর্শে আসেন। বিপ্লবী যতীন্দ্র মুখোপাধ্যায় [বাঘাযতীন] ও পুলিন দাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল। তাই তিনি ফাইনান্স পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতি পাননি। প্রায় তিন বছর মেঘনাদের জীবন অনিশ্চয়তার মধ্যে কাটে। সেই সময় তিনি ভেবে উঠতে পারছিলেন না, ঠিক কি করবেন।

ভাবনার হাত থেকে রেহাই পান বিজ্ঞান কলেজে পদার্থবিদ্যার লেকচারার নিযুক্ত হয়ে। স্যার আশুতোষ মেঘনাদকে নতুন তৈরী হওয়া বিজ্ঞান কলেজে সুযোগ করে দেন। তিনি এই পদে যোগদান করে অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে গবেষণাকার্যেও আত্মনিয়োগ করেন। এবং ১৯১৯ খ্রী. ডি. এস. সি. ও ১৯২০ খ্রী. প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন। তিনি এই ডিগ্রী ও বৃত্তি আপেক্ষিক তত্ত্ব ও আলোর ভর বিষয়ে মৌলিক গবেষণার জন্য পান। চাপের প্রভাবে কিভাবে বৈদ্যুতিক শক্তিসম্পন্ন অণু গঠিত হয়, তাঁর গবেষণা সেই তথ্য উদ্‌ঘাটন করে। এই আবিষ্কারে বিজ্ঞানজগতে ছড়িয়ে পড়ে তাঁর খ্যাতি। তিনি তাঁর নবাবিষ্কৃত পদ্ধতিতে সূর্য ও নক্ষত্রের গঠন পদ্ধতির বিশদ ব্যাখ্যা করেন। তাঁর আবিষ্কৃত পদ্ধতি বিজ্ঞানের একটি মূলসূত্র বলে পরিগণিত হয়। এবং এই আবিষ্কার গত তিন'শ বছরের মধ্যে যে বড় বড় দশটি হয়েছে তার মধ্যে একটি। এরপর থেকে মেঘনাদ তাঁর জীবনের পথ ঠিক করে নেন। তিনি সেই বছরই গুরুপ্রসন্ন বৃত্তি নিয়ে বিলেতে যান।

মেঘনাদ লণ্ডনে অধ্যাপক ফাউলারের অধীনে এবং জার্মানীতে অধ্যাপক নার্নস্টের অধীনে বেশ কিছুদিন গবেষণা করেন। এবং আরো কয়েকজন বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে তাঁর কাজ করার সুযোগ ঘটে। বিদেশ

থেকে ফিরে এসে বিজ্ঞান কলেজে খয়রা অধ্যাপকের পদ পান তিনি। এখানে কিছুদিন থাকার পর ১৯২৩ খ্রী. এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে মেঘনাদ সাহা ছিলেন একটানা পনের বছর। এই সময় গবেষণাকার্যে নিযুক্ত থেকে তিনি অনেক মূল্যবান গবেষণামূলক প্রবন্ধাদি প্রকাশ করেন। পরমাণুর গঠন সম্পর্কে তাঁর এই নতুন তথ্য বিজ্ঞানের জগতে অত্যন্ত মূল্যবান সংযোজন।

বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহার নাম দেশে এবং বিদেশে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। তিনি প্রভূত সম্মান পান বিভিন্ন সংস্থা থেকে। ১৯২৬ খ্রী. তিনি বিজ্ঞান ও কংগ্রেসের গণিত ও পদার্থবিদ্যা শাখার সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯২৭ খ্রী. তিনি পান এফ. আর. এস. উপাধি, যা ইংল্যাণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান। সেই সময় তাঁর বয়স মাত্র ৩৫ বছর। এ ছাড়াও মেঘনাদ সাহা বিভিন্ন জায়গা থেকে বহু সম্মান পান।

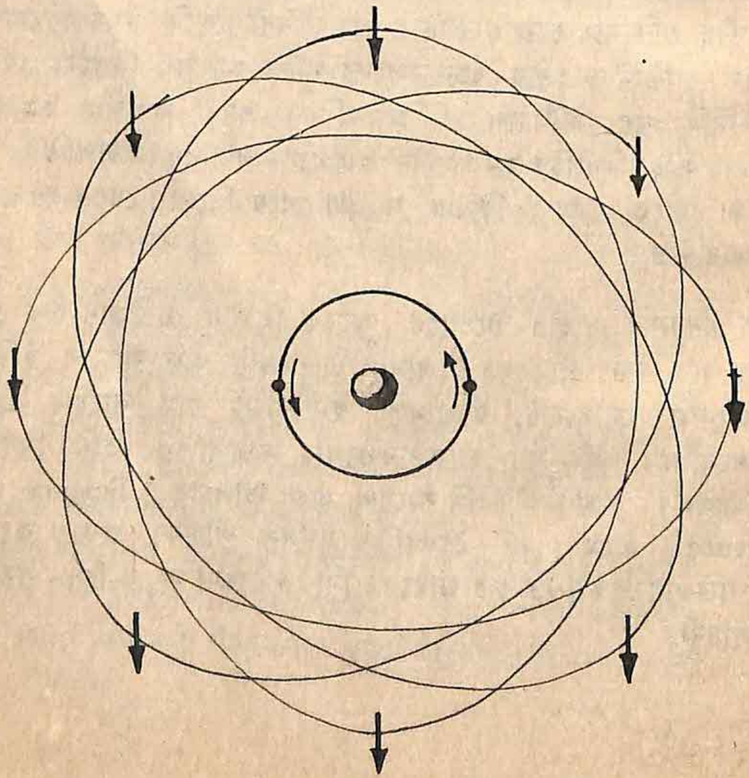
তিনি ফ্রান্সের জ্যোতির্বিদ পরিষদের আজীবন সভ্য এবং লণ্ডন পদার্থবিদ্যা প্রতিষ্ঠানের ফাউণ্ডেশন ফেলো নির্বাচিত হন। তিনি ভারতীয় প্রতিনিধি হয়ে ভোলটার শতবার্ষিকী স্মৃতি উৎসবে যোগদান করেন। তিনি ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদের গঠিত শুভেচ্ছা মিশনের একজন প্রতিনিধি হয়ে ইউরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণ করেন। ১৯৩৪ খ্রী. মেঘনাদ সাহা নির্বাচিত হন বিজ্ঞান কংগ্রেসের সাধারণ সভাপতি। এবং এছাড়া তাকে বহুবার বিভিন্ন আমন্ত্রণ পেয়ে বিদেশে যেতে হয় বক্তৃতা দেওয়ার জন্য।

দেশে মেঘনাদ সাহার উদ্যোগে অনেক বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান জন্ম নেয়। এদের মধ্যে উত্তর প্রদেশের ন্যাশানাল একাডেমি অফ সায়েন্স, ইণ্ডিয়ান ফিজিক্যাল সোসাইটি, ন্যাশানাল ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই সব প্রতিষ্ঠানগুলোর সভাপতিও তিনি নির্বাচিত হয়েছিলেন। এছাড়াও তিনি সায়েন্স এণ্ড কালচার [Science and Culture] নামে একটি বৈজ্ঞানিক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকায় প্রকাশিত হত ভারতের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক ও শিল্প সমস্যার আলোচনা।

বৈজ্ঞানিক হয়ে শুধু মাত্র বিজ্ঞানের বিষয় নিয়েই গবেষণা করতেন না মেঘনাদ সাহা। ব্যবহারিক বিজ্ঞানের ফলে কিভাবে জাতির কল্যাণ হতে পারে সেদিকেও যথেষ্ট দৃষ্টি ছিল এই বিখ্যাত বিজ্ঞানীর।

এরপর ১৯৩৯ খ্রী. মেঘনাদ আবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালিত অধ্যাপকের পদে ফিরে আসেন। তাঁর উদ্যোগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থাপিত হয় ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স। যদিও বিজ্ঞান সাধনা করাই মেঘনাদ সাহার কাজ ছিল, তবু তিনি সাধারণ মানুষের দুঃখ দৈন্যে খুবই ব্যথা অনুভব করতেন। দামোদরের বন্যা, উত্তরবঙ্গের বন্যা ও পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের বিষয় নিয়ে যথেষ্ট চিন্তা করতেন। কি করে এর সমাধান করা যায় সে বিষয়ে তাঁর চেষ্টা ছিল যথেষ্ট।

ভারতের বিভিন্ন পরিকল্পনা কমিটির সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। তিনি লোকসভার সদস্যও ছিলেন। কিন্তু এই বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক অকালে মারা যান। তাঁর এই মৃত্যু নেহাতই মর্মান্তিক। তিনি ১৯৫৬ খ্রী. ১৬ই ফেব্রুয়ারী দিল্লীতে হঠাৎ পরলোক গমন করেন।



জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ

জ্ঞানচন্দ্রের আদি বাসস্থান ছিল হুগলী জেলায় আলম বাটী গ্রামে। তাঁর পিতা রামচন্দ্র ঘোষ ছিলেন কণ্ট্রাকটার। অভ্র ব্যবসায়ী। তাই তাঁকে ছোটনাগপুরের অভ্রখনি অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে বাস করতে হত। ১৮৯৪ খ্রী. ১৪ই সেপ্টেম্বর জ্ঞানচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন পুরুলিয়া শহরে।

ছোটবেলা থেকেই জ্ঞানচন্দ্র বিভিন্ন কাজে তাঁর মেধার পরিচয় দেন। ১৯০৩ খ্রী. তিনি গিরিডি স্কুলে এসে ভর্তি হন ষষ্ঠ শ্রেণীতে। ১৯০৯ খ্রী. ছোট-নাগপুর বিভাগ থেকে প্রথম হয়ে এণ্ট্রাস পরীক্ষায় পাশ করেন। সোজা এসে ভর্তি হন প্রেসিডেন্সী কলেজে আই. এস. সি. পড়ার জন্য। এই সময় থেকে তাঁর জীবনের মোড় ঘুরে যায়। তিনি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের নজরে পড়েন। তাঁর অসাধরণ মেধা আচার্য রায়কে সম্মোহিত করে দেয়। তিনি কয়েকদিনের মধ্যে আচার্য রায়ের প্রিয় পাত্র হয়ে ওঠেন। তিনি এত প্রিয় হয়েছিলেন যে প্রত্যেকদিন সন্ধ্যায় আচার্য রায়ের সঙ্গে গড়ের মাঠে বেড়াতে যেতেন।

জ্ঞানচন্দ্র একে একে আই. এস. সি., বি. এস. সি. ও এম. এস. সি. পরীক্ষায় ভাল ফল করে উর্ত্তীর্ণ হন। তিনি এম. এস. সি. পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন। জ্ঞানচন্দ্র সব পরীক্ষায় বৃত্তি ও স্বর্ণপদক পেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর পড়ার সময় বাবার মৃত্যু হয় ফলে খুব আর্থিক অনটনের মধ্যে পড়তে হয় তাঁকে।

জ্ঞানচন্দ্রর অবস্থা দেখে স্যার আশুতোষ এম. এস. সি. পরীক্ষার ফল বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাকে এম.এস.সি. ক্লাসে পড়ানোর জন্য নিযুক্ত করেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি সাড়ে তিন বছর অধ্যাপনা করেন। এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে গবেষণার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করে আনন্দ পান। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল লবণাক্ত জলের প্রকৃতি। গবেষণার ফল লণ্ডন কেমিক্যাল সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এরপর ১৯১৮ খ্রী. জ্ঞানচন্দ্র প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পান ৫০০ টাকার এবং পরে পান ডি. এস. সি. ডিগ্রী।

সেই সময় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সদস্য ছিলেন স্যার ফিলিপ হার্টস। তাঁর সঙ্গে জ্ঞানচন্দ্রের পরিচয় হয়। তিনি জ্ঞানচন্দ্রের মৌলিক গবেষণার প্রবন্ধ পড়ে মুগ্ধ হন। তিনি বুঝতে পারেন এই তরুণ বিজ্ঞানী খুবই সম্ভাবনাময়। স্যার ফিলিপ তাই স্যার আশুতোষকে অনুরোধ করেন তাঁকে যেন বিলাতে পাঠানো হয়। এরপর বিলেতে যান জ্ঞানচন্দ্র। তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্লেকে গবেষণা করতে শুরু করেন। তাঁর মতবাদ প্রচারিত হয়। লণ্ডন থেকে জ্ঞানচন্দ্র যান বার্লিন। সেখানে অধ্যাপক সার্ণস্ট জ্ঞানচন্দ্রের গবেষণা সম্বন্ধে জার্মাণ ভাষায় বক্তৃতা দেন। অধ্যাপক হেবার জ্ঞানচন্দ্রের প্রবন্ধগুলো জার্মান ভাষার প্রকাশ করেন।

জ্ঞানচন্দ্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েরও রসায়নের অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৯২১ খ্রী. তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন। এখানে তিনি শুধুমাত্র অধ্যাপনাই করতেন না গবেষণার কাজে নিজেকে নিযুক্ত করেছিলেন। গবেষণার বিষয় ছিল জড়পদার্থের উপর আলোকরশ্মির প্রভাব। ১৯২৫ খ্রী. তিনি বিজ্ঞান কংগ্রেসের রসায়ন শাখার সভাপতি মনোনীত হন। তিনি তাঁর গবেষণা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধরচন্দ্র মুখার্জী মেমোরিয়াল হলে, ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দে। এই বিজ্ঞানীর তত্ত্বাবধানে থেকে বহু ছাত্র ঢাকায় মৌলিক গবেষণা করেন। এবং প্রত্যেকেই যশস্বী হন।

জ্ঞানচন্দ্র বিজ্ঞান বিষয়ক বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। তিনি ইণ্ডিয়ান রিসার্চ এসোসিয়েশনের মন্ত্রণা-পরিষদের জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির ও যুক্ত বাঙ্গলার শিল্প-পরিকল্পনা কমিটির সভ্য ছিলেন।

১৯৩৯ খ্রী. বাঙ্গালোরে যে সায়েন্স ইনস্টিটিউট গঠিত হয়েছিল, তিনি তার ডিরেক্টার নিযুক্ত হয়েছিলেন। এর পরে তিনি ভারত সরকারের শিল্প-ডিরেক্টর এবং হিজলীর ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেক্নলজির ডিরেক্টর নিযুক্ত হন।

জ্ঞানচন্দ্র ঘোষকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলারের পদেও কিছুদিন কাটাতে হয়েছিল। যদিও এ পদে অবস্থানের সময় খুবই কম ছিল। ১৯৫৪ খ্রী. ১২ই মার্চ থেকে ১৯৫৫ খ্রী. এপ্রিল মাস পর্যন্ত। এরপর তাকে চলে যেতে হয় ভারত সরকারের আহ্বানে। সেখানে তিনি পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য নিযুক্ত হয়েছিলেন। এই প্রথিতযশা বিজ্ঞানী ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন।

প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ

ভারতে পরিসংখ্যান বিজ্ঞানের অনন্য প্রতিষ্ঠাতা প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের জন্ম হয় কলকাতার কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের পৈত্রিক বাসভবনে। তাঁর পিতা প্রবোধচন্দ্র ছিলেন একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। মা নিরোদভাষিনী, প্রখ্যাত চিকিৎসা ও শিক্ষাবিদ্ নীলরতন সরকারের ভগিনী।

প্রশান্তচন্দ্র ছোটবেলায় শিক্ষা গ্রহণ করেন ব্রাহ্ম বালক বিদ্যালয়ে। ১৯০৮ খ্রী. এখান থেকে তিনি এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পদার্থ-বিদ্যায় অনার্স নিয়ে বি. এস. সি. পাশ করেন প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে। পরের বছর প্রশান্তচন্দ্র ইংল্যাণ্ডে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কিংস কলেজে গণিত নিয়ে পড়তে শুরু করেন। কিন্তু এক বছর পর প্রধান পাঠ্য হিসেবে তিনি বেছে নেন পদার্থবিদ্যাকে।

এই পদার্থবিদ্যা নিয়ে পাশ করার পর প্রশান্ত চন্দ্র কেমব্রিজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিখ্যাত ক্যাভেনডিস গবেষণাগারে গবেষনার ব্যবস্থা করে অল্প কয়েকদিনের ছুটি কাটাতে দেশে ফিরলেন। কিন্তু এর ঠিক আগে এমন একটা ঘটনা ঘটেছিল যা তাঁর বৈজ্ঞানিক জীবনে মোড় ঘুড়িয়ে দিল।

একদিন সকালে তিনি পাঠাগারে বসে ছিলেন সেই সময় শিক্ষক মেকলে তাঁকে বায়োমেট্রিকা নামে একটি পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যা দেখান। এতে ছিল পরিসংখ্যান বিষয়ক কিছু প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধগুলো পড়ে প্রশান্তচন্দ্র বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। তাই তিনি দেশে ফেরার সময় বায়োমেট্রিক পত্রিকার সমস্ত সংখ্যাগুলো কিনে তিনি দেশে ফেরেন। দেশে এসে তিনি প্রবন্ধগুলো আরো গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন। এবং তখন থেকেই তিনি স্থির করেন পরিসংখ্যান নিয়েই তিনি কাজ করবেন।

এই বিষয়ে প্রশান্তচন্দ্র যে দুজন মনীষীর কাছ থেকে বিশেষ অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন তাঁরা হলেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ব্রজেন্দ্রনাথ শীল।

এরপর দেশে ফিরে প্রশান্ত চন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। ক্যাভেনডিস ল্যাবরোটরীতে গবেষণার কাজে তাঁর আর যোগ দেওয়া হয়নি। প্রেসিডেন্সি কলেজে কাজ করার সময় তিনি কয়েকজন সহকর্মী ও গবেষক ছাত্রের সহায়তায় পরিসংখ্যানের বিভিন্ন বিষয়ে চর্চা শুরু করলেন। বিশের দশকে তিনি পরিসংখ্যান নিয়ে একটা কাজও করে ফেললেন। তাঁর এই কাজ পরিসখ্যান বিজ্ঞানে তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করল।

তারপর আবহতত্ত্ব, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, কৃষিবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ের বিভিন্ন সমস্যা তিনি পরিসংখ্যানের সাহায্যে বিশ্লেষন করেন। এবং এর গুরুত্ব ক্রমশঃ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। ভারতবর্ষে বিজ্ঞানের এ আর এক নতুন দিক। অনেক সম্ভাবনাময়।

প্রশান্তচন্দ্রের নেতৃত্বে পাঠক্রম চালু হল। ১৯৪১ খ্রী. থেকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর স্তরে পরিসংখ্যান বিষয়ে শিক্ষাদান শুরু হল—এই বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হলেন প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ। প্রশান্তচন্দ্র পরিসংখ্যান বিষয়ক একটি পত্রিকাও প্রকাশ করতে থাকেন, নাম সংখ্যা। সম্পাদক উনি নিজেই ছিলেন। এই পত্রিকাটি ১৯৩৩ খ্রী. প্রথম প্রকাশিত হয়।

তিরিশের দশকের গোড়ার দিকে প্রশান্তচন্দ্রের উদ্যোগে প্রেসিডেন্সি কলেলেজের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে গঠিত হয়েছিল। ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস-টিক্যাল ইনস্টিটিউট। এরপরে ঐ ইনস্টিটিউট পাকাপাকি ভাবে নিজস্ব গৃহ নির্মাণ করে, স্থানান্তরিত হয় ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডে। এই প্রতিষ্ঠানের কর্মধারা ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। তাই দিল্লী, বোম্বে, মাদ্রাজ এবং ব্যাঙ্গলোরে এর শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫৯ খ্রী. এটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে ঘোষিত হয় এবং এই সংস্থা পরিসংখ্যানে ডিগ্রী দেওয়ার অধিকার অর্জন করে।

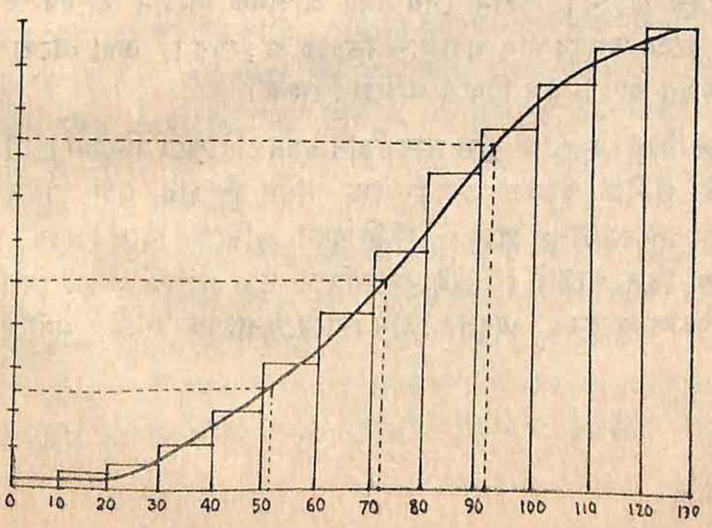
প্রশান্তচন্দ্রের তত্বাবধানে ক্রমে ক্রমে ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউট আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করে। তাঁর মৃত্যুর শেষ দিন পর্যন্ত তিনি এই

সংস্থার সর্বেসর্বা ছিলেন। এই প্রখ্যাত বিজ্ঞানীর দেহান্তর হয় ১৯৭২ সালের ২৮শে জুন।

প্রশান্তচন্দ্র দেশ বিদেশ থেকে বিভিন্ন সম্মানে ভূষিত হয়েছিলেন। লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন ১৯৪৫ খ্রী.। ১৯৪৬ খ্রী. তিনি রাষ্ট্রপুঞ্জের পরিসংখ্যান কমিশনের সভাপতি হয়েছিলেন। ইংল্যাণ্ডের কেমব্রিজ ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, চেকোশ্লোভাকিয়া, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশের বিভিন্ন সংস্থা থেকেও তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রতিভার প্রতি স্বীকৃতি জানানো হয়েছিল।

১৯৪৯ খ্রী. থেকে ভারত সরকারের পরিসংখ্যান সম্পর্কিত কাজকর্মে প্রশান্তচন্দ্র উপদেষ্টা রূপে কাজ করেন। ১৯৬৭ খ্রী. পর্যন্ত প্রশান্তচন্দ্র পরিকল্পনা কমিশনের কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। নমুনা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের যে পদ্ধতি তিনি আবিষ্কার করেন, বিজ্ঞানীমহলে তা বিশেষভাবে সমাদৃত হয়।

১৯৫০ খ্রী. ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের মূল সভাপতির পদে তিনি নিযুক্ত হন। বিজ্ঞান ও স্বদেশের প্রতি তাঁর অবদানের জন্য ১৯৬৮ খ্রী. তিনি ভারত সরকারের কাছ থেকে পদ্মবিভূষণ উপাধি লাভ করেন। ভারত, পরিসংখ্যান বিজ্ঞানে প্রশান্ত মহলানবীশের কথা কোনদিন ভুলতে পারবেনা।



হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা

মহাজাগতিক রশ্মি সম্পর্কে গবেষণা করে যে ভারতীয় বৈজ্ঞানিক যশস্বী হয়েছেন তাঁর নাম হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা। ১৯০৯ খ্রী. ৩০ শে অক্টোবর ভাবা বোম্বাইয়ের এক সম্ভ্রান্ত পার্শি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতামহ ছিলেন মহীশূর রাজ্যের শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টার বা অধিকর্তা। পিতা থাকতেন বাঙ্গালোরে ভারতীয় বিজ্ঞান মন্দিরে। তিনি ছিলেন টাটা কোম্পানীর একজন প্রতিনিধি।

ভাবার প্রাথমিক শিক্ষা দীক্ষা হয় বোম্বাইয়ে। এর পর তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য যান বিদেশে। এই সময় তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ১৭ বছর। সেখানে তিনি কেমব্রিজের গণ্‌ভিল ও কায়াস কলেজে ভর্তি হন। এক বছর পরেই ভাবা গণিতে ট্রাইপাস [প্রথম অংশ] পাশ করেন। পরে তিনি ইঞ্জিনীয়ারিং পড়তে থাকেন। ১৯৩০ খ্রী. তিনি এই বিষয় পাশ করেন। পড়া কালীন ভাবা ছুটির অবসরে একটি বৃটিশ ফার্মে ইঞ্জিনীয়ারিং এর কাজে শিক্ষানবিশী থাকেন।

ইঞ্জিনীয়ারিং ডিগ্রী লাভ করার পর ভাবা গাণিতিক বিজ্ঞানের দিকে মনোনিবেশ করেন। তিনি সেই সময় আধুনিক বিজ্ঞান যাঁদের কাছে অধ্যয়ন করেন তাদের নাম অধ্যাপক ডিরাক ও মটের। এরা প্রত্যেকেই এক একজন তাঁর নিজস্ব বিষয়ে অভিজ্ঞ শিক্ষক।

ভাবা একাধিক কলেজে বৃত্তি পান তিনি যখন বিলেতে ছিলেন। তিনি ১৯৩২ খ্রী. ট্রিনিটি কলেজ থেকে উচ্চ গণিত শিক্ষার জন্য রাউজ বল ট্র্যাভেলিং স্টুডেন্টশিপ পান। তিনি যখন জুরিকে ছিলেন তখন তাঁর অধ্যাপক ছিল পাউলি। এই সময় তিনি উচ্চ শ্রেণীর একটি মৌলিক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এরপর তিনি রোমে অধ্যাপক ফার্মির অধীনে ও

উট্রেক্টে অধ্যাপক ক্রামারের অধীনে গবেষণা করেন। ভাবা কোপেন-হেগেনে অধ্যাপক নীল বোরের পদার্থ বিজ্ঞানের বিখ্যাত গবেষণাগারে কাজ করেন। ১৯৩৫ খ্রী. তিনি তিন বছরের জন্য আইজাক নিউটন স্টুডেন্টশিপ পেয়েছিলেন।

ভারতীয়দের মধ্যে ভাবাই প্রথম রয়্যাল একজিবিশন স্কলারশিপ পান। এই বৃত্তি পাওয়ার সময় সীমা ছিল তিন বছর। ১৯৩৭ খ্রী. তিনি এই বৃত্তিটি পেয়েছিলেন। কেমব্রিজ উচ্চ বিজ্ঞানে ভাবা বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সেগুলো হল: মহাজাগতিক রশ্মির বিকিরণ, আণবিক পদার্থ-বিজ্ঞান, কোয়াস্টাম গতিবিদ্যা প্রভৃতি।

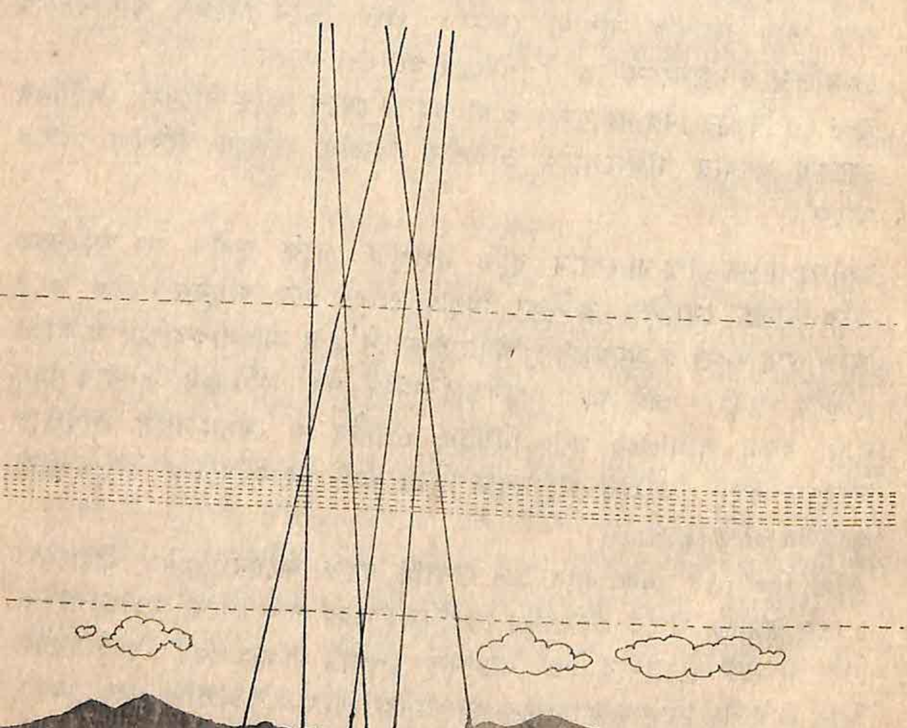
১৯৩৭ খ্রী. ভাবা ম্যাক্সবার্ণের আমন্ত্রণে এডিনবরায় যান এখানে তিনি মহাজাগতিক রশ্মি বিকিরণ সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। ১৯৩৯ খ্রী. লণ্ডন রয়্যাল সোসাইটি ম্যানচেস্টারে অধ্যাপক ব্ল্যাকেন্টের মহাজাগতিক রশ্মির গবেষণাগারে বৈজ্ঞানিক হিসেবে তিনি কাজ করেছিলেন। এই জন্য তাঁর আর্থিক সাহায্য মেলে। পরে তিনি নিজেই স্বাধীনভাবে কেমব্রিজ ও ম্যানচেস্টারে ঐ বিষয়েই গবেষণা করেন।
শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধ। ভাবা এরপর দেশে ফিরে আসেন। সেইসময় থেকেই ভাবার বাঙ্গালোরে ভারতীয় বিজ্ঞান মন্দিরে গবেষণা চলতে থাকে।

মহাজাগতিক রশ্মি বা ব্যোম রশ্মি মহাশূন্য থেকে সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করে বিভিন্ন মৌলিক কণিকা বিদ্যুৎ-আবিষ্ট হয়ে বায়ুমণ্ডল ভেদ করে অতি সুক্ষ্ম তরঙ্গের আকারে পৃথিবীতে আসে এবং আলোকরশ্মির আকারে ছড়িয়ে পড়ে। এই সমস্ত কণিকা সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করবার সময় নানা রকম সংঘাতের ফলে নিউট্রন, প্রোটন ও মেসন নামে কণিকায় পরিণত হয়। ভাবার গবেষণার বিষয় এই মহাজাগতিক রশ্মির দ্বারা জগতের রহস্য উদঘাটন।

ভাবা বিলাতের এফ. আর. এস. উপাধি লাভ করেন ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁকে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে মহাজাগতিক রশ্মি সম্পর্কে গবেষণার জন্য এডামস্ পুরস্কার দেওয়া হয়। সেই বছরই তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে পদার্থবিদ্যা শাখার সভাপতি এবং ১৯৫১ খ্রী. তিনি মূল সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন। বোম্বাই শহরে ১৯৪৫

খ্রী. টাটা ইনস্টিটিউট গবেষণাগার স্থাপিত হয়। প্রথম থেকেই ভাবা এই ইনষ্টিটিউটের ডিরেক্টার নিযুক্ত হন। তিনি ভারতীয় আণবিক গবেষণা কমিটি ও আণবিক শক্তি গবেষণা পরিষদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হন। ভারত সরকারের আণবিক শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যানের পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৯৫৪ খ্রী. আগস্ট মাসে অস্ট্রেলিয়ার পার্থে অনুষ্ঠিত প্যান ইণ্ডিয়ান ওকোন অ্যাসেসিয়েশন এর দ্বিতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে তিনি ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন। এই বছর ভাবা ভারতের রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে পান পদ্মবিভূষণ উপাধি।

১৯৫৫ খ্রী. ৮ই আগস্ট মানবজাতির কল্যাণে পারমাণবিক শক্তির ব্যবহার সম্পর্কে জেনেভায় বিশ্বের পরমাণু বিজ্ঞানীদের মহাসম্মেলন আরম্ভ হয়। এই সম্মেলনে ভাবা মূল সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন। ভারতীয় বিজ্ঞানী হিসেবে হোমি জাহাঙ্গীর ভাবার এই সম্মান খুবই প্রসংশনীয়।



শিশিরকুমার মিত্র

শিশিরকুমারের জন্ম হয় কলকাতায়, ১৮৯৯ খ্রী. অক্টোবর মাসে। ছোটবেলায় তিনি পড়শোনা করেন ভাগলপুরে। এরপর তিনি পড়েন কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে। শিশিরকুমার ১৯১২ খ্রী. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থ বিদ্যা নিয়ে এম. এস. সি. পাশ করেন। তারপর শুরু হয় শিশিরকুমারের চাকরি জীবন। বিহার ও বাঙলার বিভিন্ন কলেজে অধ্যাপনা করেন। তিনি ফিরে আসেন কলকাতায়। নব প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগে লেকচারার নিযুক্ত হন। পরে ১৯১৯ খ্রী. ডঃ রমনের অধীনে গবেষণা করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. এস. সি. উপাধি পান।

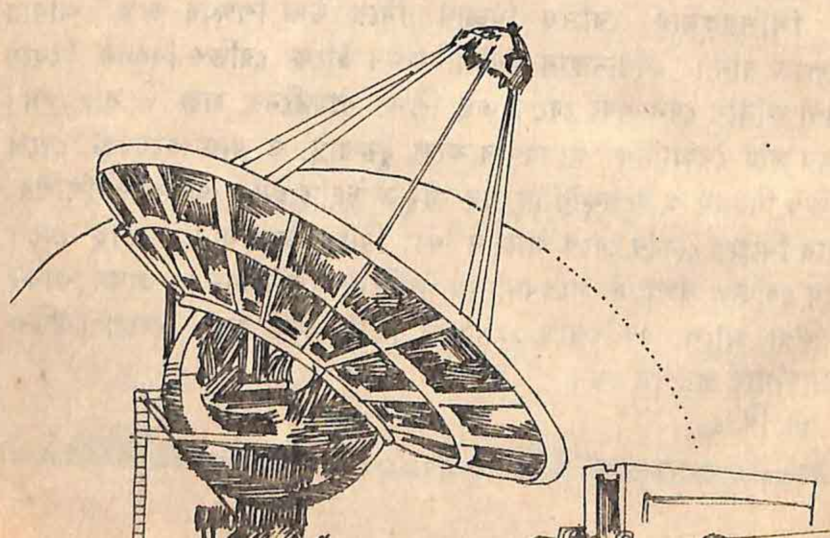
শিশিরকুমার ফ্রান্সে যেয়ে সবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক ফ্যাব্রির অধীনে গবেষণা করে ডক্টরেট উপাধি পান। এর পর তিনি কিছুদিন মাদাম কুরীর অধীনে ইনস্টিটিউট অব রেডিয়াম নামে প্রতিষ্ঠানেও গবেষণা করেন।

১৯২৩ খ্রী. শিশিরকুমার ফিরে আসেন দেশে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে খয়রা অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত করে। কিন্তু এর পরে ১৯৩৫ খ্রী. শিশিরকুমার রেডিও বিজ্ঞান নিয়ে উচ্চ শিক্ষার জন্য আবার বিলেতে যান। সেখানকার বৈজ্ঞানিকগণ তাঁকে রেডিও-বিজ্ঞান বিষয়ে ধারণা করিয়ে দেন এবং দেশে এই শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য উৎসাহ দেন। যুদ্ধের জন্য বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে যুক্তরাষ্ট্র ও অন্য কয়েকটি দেশে রেডিও বিজ্ঞান ও ইলেক্ট্রনিক্সের প্রভূত উন্নতি হয়। এই সমস্ত শিশিরকুমার নিজের চোখে দেখে আসেন এবং বিস্মিত হয়ে যান। তাই দেশে ফিরে রেডিও সম্পর্কে গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করতে চান। প্রথম প্রথম বহু বাধা আসে এবং শেষে ১৯৪২ খ্রী. তিনি সফল হন। দেশে রেডিও গবেষণাগার স্থাপিত হয়।

শিশিরকুমার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রেডিও একটি ঐচ্ছিক বিষয়রূপে পদার্থবিদ্যায় এম.এস. সি. তে পাঠ্যতালিকাভূক্ত করেন এবং তাঁরই চেষ্টায় কলকাতায় রেডিও-ফিনিস ও ইলেক্‌ট্রনিক্‌সের ইনস্টিটিউট স্থাপিত হয়। তিনি এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম ডিরেক্টর নিযুক্ত হন।

আলোকরশ্মির তরঙ্গ বিশ্লেষণ সম্পর্কে প্রথম কাজ শুরু করেন শিশির-কুমার। তিনি এই সম্পর্কে একখানি বইও রচনা করেছিলেন। এই বই বৈজ্ঞানিকমণ্ডলীর বিশেষ প্রশংসা পায়। তিনি উচ্চতর বায়ুস্তর নিয়েও একটি পুস্তক প্রকাশ করেন।

শিশিরকুমার রাতের আকাশের ক্ষীণ দীপ্তির সম্পর্কে ও নাইট্রোজেনের মধ্য দিয়ে বৈদ্যুতিক বিচ্ছুরণ নিয়ে গবেষণা করেন। তাঁর বক্তব্য এই প্রভার কারণ সক্রিয় নাইট্রোজেন। শিশিরকুমারের এই গবেষণায় আকৃষ্ট হয়ে অস্ট্রেলিয়ার বিজ্ঞান-গবেষণা সংস্থা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে আয়োনস্ফিয়ার মাপক মূল্যবান একটি যন্ত্র উপহার দেন। কলকাতার উপকণ্ঠে হরিণঘাটায় অস্ট্রেলিয়ার পাঠানো এই যন্ত্রটি স্থাপিত করা হয়েছে। শিশিরকুমার ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের পদার্থবিদ্যা শাখার সভাপতি হন ১৯৩৪ খ্রী.। ১৯৫৫ খ্রী. তিনি হন মূল সভাপতি। তিনি ভারত সরকারের বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা সংস্থার রেডিও রিসার্চ বিভাগের প্রথম চেয়ারম্যান। শিশিরকুমার ১৯৫৩ খ্রী. ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব এয়ারোনটিক্স এবং ইলেক্‌ট্রনিক্সেরও সভাপতি মনোনীত হয়েছিলেন।



প্রিয়দারঞ্জন রায়

প্রিয়দারঞ্জন ১৮৮৮ খ্রী. ১৬ই জানুআরি চট্টগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন [বর্তমান বাংলাদেশে]। ছোটবেলায় তিনি পড়াশোনা করেন গ্রামের স্কুলে। পরে উচু ক্লাসে অধ্যয়নের জন্য তিনি কলকাতা আসেন; এখানে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে পদার্থ বিদ্যায় ও রসায়ন বিদ্যায় অনার্স নিয়ে বি. এ. পাশ করেন। ১৯১১ খ্রী. প্রিয়দারঞ্জন অজৈব রসায়ন বিদ্যায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে এম. এ. পাশ করেন। তাঁকে দেওয়া হয় মতিলাল মল্লিক সুবর্ণ পদক।

এরপরে তিনি গবেষণা করতে শুরু করেন। সেই সময় এক দুর্ঘটনা ঘটে তাঁর বাঁ চেখে অ্যাসিড পড়ে। তিনি চিরদিনের জন্য বাঁ চোখটি হারিয়ে ফেলেন। ১৯১৮ খ্রী. থেকে শুরু হয় প্রিয়দারঞ্জন-এর চাকরি জীবন; তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-কলেজে রসায়নবিদ্যার সহকারী পালিত অধ্যাপক হয়ে যোগদান করেন। এক নাগাড়ে প্রায় এগার বছর অধ্যাপনা করার পর তাঁর বিদেশ যাওয়ার সুযোগ ঘটে। তিনি ঘোষ-ট্র্যাভেলিং ফেলোশিপ নিয়ে বিদেশে যান।

তিনি সুইজারল্যাণ্ডে অধ্যাপক এব্রাহিমের অধীনে এবং অস্ট্রিয়ায় অধ্যাপক এমিকের অধীনে মাইক্রো-কেমিক্যাল পরীক্ষাগারে গবেষণা করার সুযোগ পান। তারপর বিদেশ থেকে ১৯৩৭ খ্রী. ভারতে ফিরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়নশাস্ত্রে খরা অধ্যাপক এবং ১৯৪৬ খ্রী. বিশুদ্ধ রসায়নশাস্ত্রে পালিত অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

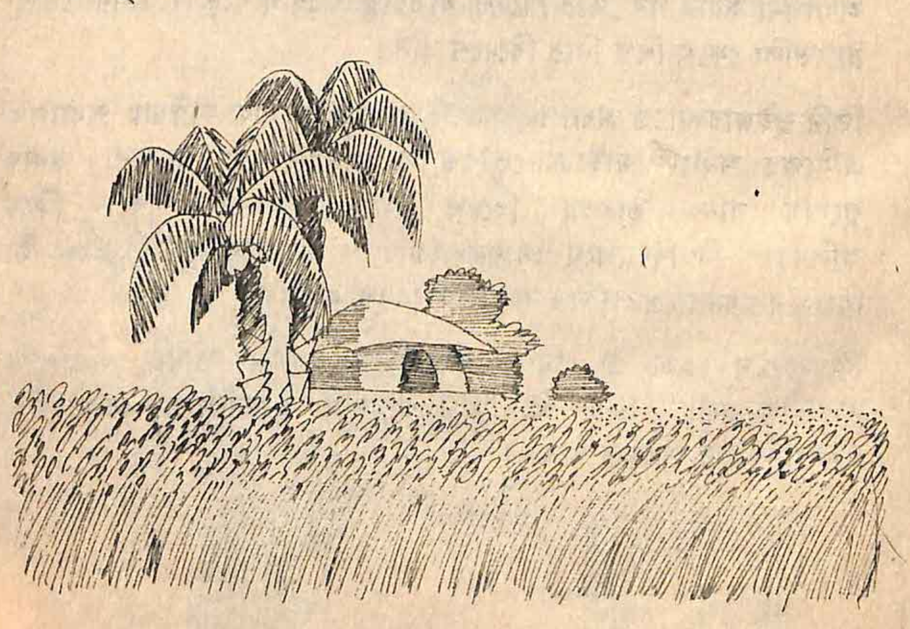
প্রিয়দারঞ্জন ১৯৩৯ খ্রী. বিজ্ঞান-কংগ্রেসের রসায়ন শাখার সভাপতি মনোনীত হন। ১৯৪৭ খ্রী. তিনি ভারতীয় কেমিক্যাল সোসাইটির সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন।

গবেষণা করেন। তারই গবেষণার ফলে ভারত পঙ্গপালের হাত থেকে রেহাই পায়। আফজল হুসেন গবেষণা করে ঐ জাতীয় পতঙ্গকে তাড়িয়ে দেওয়ার পথ বাত্‌লে দেন। পতঙ্গর হাত থেকে বাঁচার উপায় আবিষ্কৃত হয়।

তিনি ১৯৩২ খ্রী. লায়ালপুর কৃষি কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ১৯৩৮ থেকে '৪৪ খ্রী. পর্যন্ত তিনি পাঞ্জাব রিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলারের পদে অধিষ্ঠিত হন।

অধ্যাপক আফজল হুসেন ভারতীয় ন্যাশানাল ইনস্টিটিউট অব সায়েন্সের প্রথম সভ্য ও কাউন্সিলের সভ্য ছিলেন। তিনি ভারতীয় সায়েন্স কংগ্রেসে ১৯৩৩ খ্রী. কৃষিবিদ্যা বিভাগের ও ১৯৩৮ খ্রী. পতঙ্গবিভাগের সভাপতিত্ব করেন। তিনি বিজ্ঞান কংগ্রেসের মূল সভাপতি হন ১৯৪৬ খ্রী.। তিনি ১৯৩৫ খ্রী. মিশরে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক পঙ্গপাল নিবারণী কনফারেন্সে ও ১৯৩৮ খ্রী. জেনেভায় অনুষ্ঠিত কৃষি-কনফারেন্সে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন।

আফজল হুসেন পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলারের পদে ছিলেন ১৯৪৪ খ্রী. পর্যন্ত। তিনি সেই পদ থেকে অবসর গ্রহণ করার পর তাঁকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি বিভাগের উপদেষ্টা নিযুক্ত করা হয়েছিল। তিনি এরপর ১৯৪৫ খ্রী. ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল ওয়ার মেমোরিয়াল কমিটির সভ্যরূপে যুক্তরাজ্য, কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্র পরিভ্রমণ করেন।



এম এস থ্যাকার

বর্তমানে বিদ্যুৎ-শক্তি মানেই দেশের শক্তি। এই বিদ্যুৎ-শক্তির শিল্পে, বিভিন্ন প্রয়োগে যিনি গবেষণা করে প্রসিদ্ধি লাভ করেন—তাঁর নাম এম এস থ্যাকার।

এখন পৃথিবীর যে দেশ যত সস্তায় বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপন্ন করতে পারে সে দেশ শিল্পে তত উন্নত। বিদ্যুৎ-শক্তির সাহায্যে কলকারখানা, ট্রেন, ট্রাম কম্পিউটার চালান হয় এবং ঘর-বাড়ি আলোকিত হয়। বিদ্যুৎ-এর অভাবে সবকিছুই অন্ধকার।

এই বিদ্যুৎ শিল্পের অগ্রণী পুরুষ আমেদাবাদে ১৯২৪ খ্রী. ৩রা ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শিক্ষা গ্রহণ করেন আমেদাবাদ এবং বোম্বাইয়ে। এরপর তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য ইউরোপে যাত্রা করেন। থ্যাকার ব্রিস্টল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইনজিনীয়ারিং বিষয়ে বি. এস. সি. উপাধি লাভ করেন এবং ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যুৎ ইনজিনীয়ারিং সম্বন্ধে স্নাতকোত্তর গবেষণা কার্য চালান। কিছুদিন পরে থ্যাকার ব্রিস্টল করপোরেশনের বিদ্যুৎ শাখায় ইনজিনীয়ার নিযুক্ত হন। এই প্রতিষ্ঠানে তিনি কয়েক বছর কাজ করেন।

এরপর থ্যাকার ১৯৩১ খ্রী. মে মাসে ভারতে ফিরে কলকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই করপোরেশনে ইনজিনীয়ার নিযুক্ত হন। এই প্রতিষ্ঠানে তিনি ছিলেন ১৯৪৭ খ্রী. পর্যন্ত, পরে এখান থেকে চলে যেয়ে তিনি বাঙ্গালোরে ভারতীয় সায়েন্স ইনস্টিটিউটে শক্তি ইনজিনীয়ারিং শাখার অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। তাঁর পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি দু বছর পর ঐ ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টার নিযুক্ত হন। থ্যাকার এই প্রতিষ্ঠানের যথেষ্ট উন্নতি করিয়ে দেন। তিনি ছাত্র ও অধ্যাপকগণের মধ্যে গবেষণার প্রবৃত্তি জাগিয়ে তোলেন। তিনি নিজে বিদ্যুৎ-ইনজিনীয়ারিং বিষয়ে

উচ্চস্তরের গবেষণা করেন। এবং বিদ্যুৎ-শক্তি সরবরাহ প্রণালীতে ব্যবহারের জন্য নানা রকম নতুন নতুন যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করেন। এর ফলে তিনি দেশ-বিদেশ থেকে বহু প্রশংসা অর্জন করেন। থ্যাকার আমেরিকার ইলেক্‌ট্রিক্যাল ইন্‌জিনীয়ারদের ইনস্টিটিউটের প্রথম ভারতীয় সভ্য নির্বাচিত হন।

ভারতে অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য এবং শিল্প বিষয়ে নানা গবেষণা করার জন্য ছাত্র অধ্যাপক সবাইকে উৎসাহ দিতেন থ্যাকার। তিনি উচ্চ ভোল্টেজ ইনজিনীয়ারিং সম্বন্ধে ও বিদ্যুৎ সম্পর্কীয় শিল্প সম্বন্ধে অনেক গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এই সম্পর্কে বহু আন্তর্জাতিক অধিবেশনে তিনি ভারতের বিশেষজ্ঞ সভ্য হিসাবে যোগদান করেন। তিনি বৃহৎ বিদ্যুৎ-কারখানার সম্পর্কে আন্তর্জাতিক অধিবেশনে ভারতীয় চেয়ারম্যান এবং পৃথিবীর শক্তি কমিশন ও ইলেকট্রা টেকনিক্যাল কমিশনের সভ্য নির্বাচিত হন। থ্যাকার ১৯৫৪ খ্রী. রিও-ডি-জেনিরোতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শক্তি-কনফারেন্সে ভারতীয় সভ্যদের নেতা নির্বাচিত হন। তিনি যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্সের সরকার কর্তৃক তাদের গবেষণাগারগুলো পরিদর্শনের জন্য নিমন্ত্রিত হন। এ ছাড়াও তিনি যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, দক্ষিণ আমেরিকা, ইউরোপ প্রভৃতি দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো দেখে সেখানকার বিজ্ঞান ও শিল্প সম্বন্ধে গবেষণা ও অধ্যয়ন করেন।

থ্যাকার ভারতের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এবং প্রত্যেককেই তাঁর সুপরামর্শ দিয়ে সাহায্য করতেন। ১৯৫৫ খ্রী. এই বৈজ্ঞানিককে পদ্মভূষণ উপাধি দিয়ে সম্মান জানানো হয়। পরে তিনি ১৯৫৫ খ্রী. ৩রা অগস্ট ভারত সরকারের শিল্প ও বিজ্ঞান সম্পর্কীয় গবেষণা কাউন্সিলের ডিরেক্টার নিযুক্ত হয়েছিলেন।



মহম্মদ অফজল হুসেন

পাঞ্জাবের বাটালা গ্রামে ১৮৮৯ খ্রী. আফজল হুসেন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পড়াশোনা শুরু হয় গ্রামেরই একটি স্কুলে। তিনি স্কুলের পড়া শেষ করে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। এবং এখান থেকেই প্রাণিবিদ্যায় অনার্স নিয়ে বি. এস. সি. ও এম. এস. সি. ডিগ্রী পান ১৯১৩ খ্রী.।

পড়াশোনায় আফজলের আগ্রহ ছোটবেলা থেকেই। তিনি দেশের অধ্যয়ন শেষ করে উচ্চশিক্ষার জন্য বিলেতে যান। সেখানে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রাইস্ট কলেজে ভর্তি হন। এই কলেজ থেকে তিনি পান ট্রাইপাস উপাধি। প্রথম অংশে তাঁর পরীক্ষার বিষয় ছিল উদ্ভিদবিদ্যা, শারীরবিদ্যা ও প্রাণিবিদ্যা এবং দ্বিতীয় অংশে ছিল প্রাণিবিদ্যা। দ্বিতীয় অংশে তিনি প্রথম শ্রেণীর অনার্স পেয়েছিলেন। আফজল বিদেশের কলেজে পড়ার সময় নিজের কৃতিত্বের জন্য অনেক-গুলো বৃত্তিও পেয়েছিলেন।

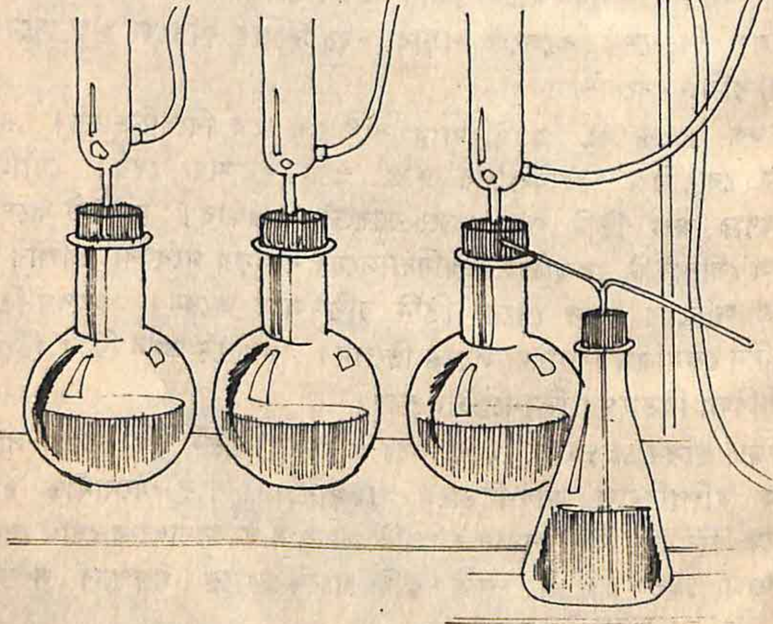
আফজল ১৯২৬ খ্রী. প্রাণিবিদ্যায় সর্বোত্তম ছাত্র বিবেচিত হয়। তাই তাঁকে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় ফ্রাঙ্ক স্মার্ট পুরস্কার দেয়। মৌলিক গবেষণার জন্য তিনি পান চার্লস ডারউইন পুরস্কার। ক্রাইস্ট কলেজ, রয়্যাল সোসাইটি, কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বালফুর গবেষণা ভাণ্ডার ও ভারত সচিবের দপ্তর থেকে তিনি বৃত্তি লাভ করেন। এরপর তিনি কিছুদিন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়েও ছিলেন। সেখানে তখন তিনি ছিলেন প্রাণিবিদ্যা বিভাগের ডিমনস্ট্রেটার হয়ে।

আফজল হুসেন ১৯১৯ খ্রী. দেশে ফিরে আসেন। তিনি তখন ভারত সচিব কর্তৃক ইম্পিরিয়াল কৃষি-বিভাগে পতঙ্গবিদের পদে মনোনীত হন। ভারতে ফিরেই তিনি পুনায় ইম্পিরিয়াল কৃষি গবেষণাগারে যোগ দেন। আফজল ১৯৩০-৩৩ খ্রী. পর্যন্ত কৃষি গবেষণাগারে পঙ্গপাল সম্পর্কে

অধ্যাপক রায় বৎজার প্রণীত ও সঙ্কলিত রসায়নিক বিশ্লেষণ-সম্পর্কিত প্রামাণিক গ্রন্থের সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য ছিলেন। ১৯৩৩ খ্রী. ভিয়েনা থেকে অণুবীক্ষণ রসায়ন সম্পর্কে যে পত্রিকা প্রকাশিত হয় তিনি তারও সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য ছিলেন।

তিনি বিদেশে বহু সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন। ১৯৫০ খ্রী. গ্রাজে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক মাইক্রোকেমিক্যাল কংগ্রেসে যোগদান করেন। ১৯৫১ খ্রী. নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত বিশুদ্ধ ও ফলিত রসায়নের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তাঁর বিশ্লেষণমূলক গবেষণা আন্তর্জাতিক প্রশংসা পায়। প্রিয়দারঞ্জনের গবেষণার মধ্যে রুবিয়ানিক অ্যাসিড, হেক্সামাইন, কুইনাণ্ডিনিক অ্যাসিড, ডাইমার্কোপ্টো-থায়ো-ডায়াজোল ইত্যাদি সম্পর্কিত গবেষণা জগদ্বিখ্যাত।

অধ্যাপক রায় ভারতের বহু বৈজ্ঞানিক সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন জীবনের শেষদিন পর্যন্ত।



জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়

১৮৯৭ খ্রী. ১৭ই ফেব্রুআরী জ্ঞানেন্দ্রনাথের জন্ম হয়। ঢাকা জেলার তিলিতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতা পূর্ণচন্দ্র রায় ছিলেন একজন প্রতিষ্ঠিত কেমিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার এবং তিনি ছিলেন ভারতবর্ষের একজন অন্যতম দিয়াশলাই শিল্পের প্রতিষ্ঠাতা।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ খুব ছোট বয়েসে তাঁর মাকে হারান এবং সেই সময়ই বাবাকে ব্যবসার জন্য চলে যেতে হয় দূরে। তাই ঠিক হয় জ্ঞানেন্দ্রনাথ মামাবাড়ি রাজশাহীতে থেকে পড়াশোনা করবেন। সেখানে তাঁর অধ্যয়ন শুরু হয় কলেজিয়েট স্কুলে। ছোটবেলায় তাঁর সময় বেশির ভাগই কাটতো খেলাধূলা এবং অভিনয়ের পেছনে। এ ছাড়াও আর একটা বিষয়ে জ্ঞানেন্দ্রনাথের আগ্রহ খুব বেশি ছিল—তা হচ্ছে ইতিহাস। এবং ইতিহাসের ওপর এই আগ্রহ তাঁর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ছিল।

সেই সব দিনে সংস্কৃত ছিল আবশ্যিক বিষয়। যে পণ্ডিত এই বিষয় ক্লাস করাতে আসতেন, ছাত্ররা তাঁর সামনে বিভিন্নভাবে মজা করত। এর মধ্যে থেকেও তিনি ভালভাবে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় পাশ করেন। জ্ঞানেন্দ্রনাথ ছোটবেলা থেকেই একটু স্বাধীনচেতা ছিলেন।

এরপর তিনি চলে আসেন কলকাতায়। পড়াশোনা শুরু হয় প্রেসিডেন্সি কলেজে। ইন্টার সায়েন্স ও বি. এস. সি. পাশ করার পর এম. এস. সি. পাশ করেন বিজ্ঞান কলেজ থেকে। এখানে তিনি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সংস্পর্শে আসেন। এবং পরে তাঁর কাছে গবেষণা করতে শুরু করেন। তিনি আচার্য রায়ের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠতে পেরেছিলেন ক্রমে ক্রমে। প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ার সময়ও তিনি খেলাধূলা তেমনি বজায় রেখেছিলেন। ক্রিকেট, ফুটবল, হকিই শুধু খেলেননি, অভিনয়ও করতেন।

তিনি ঘোষ ট্র্যাভেলিং ফেলোশিপ নিয়ে ইংল্যাণ্ডে যান ১৯২৩ খ্রী.। গবেষণা করতে শুরু করেন স্যার রবার্ট রবিনসন-এর অধীনে ম্যাঞ্চেস্টারে।

তিনি পি. এইচ. ডি. ডিগ্রী পান রবিনসনের সঙ্গে কাজ করে। বিষয় ছিল ইলেক্‌ট্রনিক থিওরি অফ ভ্যালেন্সি। এই গবেষণার জন্য জ্ঞানেন্দ্রনাথ যথেষ্ট প্রশংসা অর্জন করেন।

এরপর জ্ঞানেন্দ্রনাথ অষ্ট্রিয়া গিয়েছিলেন ডঃ প্রিগল এর সংগে কাজ করার জন্য। এখানে গবেষণার বিষয় ছিল মাইক্রোঅ্যানালাইটিক্যাল কেমেষ্ট্রি। এবিষয়ের ওপর তখন ভারতে প্রথম জ্ঞানেন্দ্রনাথের তত্ত্বাবধানে গবেষণাগার তৈরী হয়েছিল লাহোরে। এই সময় তিনি ম্যাঞ্চেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলোশিপ পান।

বিদেশ থেকে ফিরে তিনি প্রথম চাকরি গ্রহণ করেন লাহোরে, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে। ক্লাসে লেকচার দেওয়া ছাড়া তিনি একটি অর্গানিক কেমিষ্ট্রির গবেষণা বিদ্যালয় তৈরী করেন। তিনি গরীব ছাত্রদের ওপর শুধুমাত্র সহানুভূতিশীলই ছিলেন না। তিনি তাঁর ক্ষমতা অনুযায়ী প্রত্যেককে অর্থ দিয়ে সাহায্য করতেন। নোবেল পুরস্কার পাওয়া বিজ্ঞানী ডঃ খোরানা ছোটবেলায় জ্ঞানেন্দ্রনাথের তৈরী হওয়া গবেষণাগারের ছাত্র ছিলো। এ খবর পেয়ে তিনি অত্যন্ত খুশি হয়েছিলেন।

তিনি ম্যাঞ্চেস্টার থেকে ডি. এস. সি. ডিগ্রী পান ১৯৩৪ খ্রী.। জ্ঞানেন্দ্রনাথ ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটির সভাপতি ছিলেন। রসায়ন বিভাগে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি হন ১৯৩৭ খ্রী.। এবং তিনি রসায়নে ব্রিটেনের ফেলো হয়েছিলেন রয়্যাল ইনষ্টিটিউটের। ভারতেও তিনি একবার এই শাখার সভাপতি হন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জ্ঞানেন্দ্রনাথকে নতুন দিল্লীতে আসতে হয় যুদ্ধের কাজে সাহায্য করার জন্য। এটা তাঁর কাছে ছিল একরকমের প্রতিজ্ঞা। তিনি সেই কাজ সুষ্ঠভাবে সম্পাদন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁকে এই কাজের জন্য পুরস্কৃতও করা হয়েছিল। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর তিনি আর লাহোর ফিরে যেতে পারেননি সরকারের অনুরোধে। স্বাধীনতার পর তিনি ভারত সরকারের পরিকল্পনা কমিশনের সঙ্গে যুক্ত হন।

বৈজ্ঞানিক জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়ের অন্য আর যে সব বিষয়ে আগ্রহ ছিল তা হচ্ছে ইতিহাস এবং প্রত্নতত্ত্ব। তা ছাড়া ক্রিকেট ও ফুটবল খেলার ওপর তাঁর টান ছিল আবাল্য।

তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন ১৯৬৮ খ্রী.।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

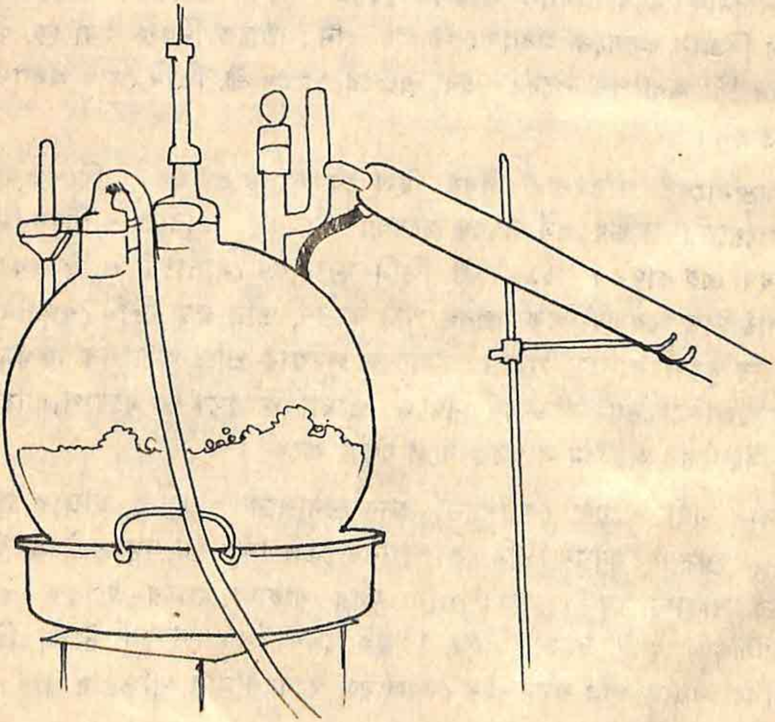
বিজ্ঞানী জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম হয় ১৮৯৩ খ্রী. ২৭শে এপ্রিল। তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে রসায়নবিদ্যা নিয়ে এম. এস. সি. ডিগ্রী লাভ করেন ১৯১৫ খ্রী.। ঐ বছরই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে রসায়ন বিভাগে অধ্যাপনা করার জন্য যোগদান করেন।

এরপর জ্ঞানেন্দ্রনাথ ১৯১৯ খ্রী. উচ্চশিক্ষার জন্য বিলেতে যান। সেখানে গবেষণা করতে শুরু করেন লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডানানের অধীনে। এখানে গবেষণা শেষ করে তিনি ডি. এস. সি. উপাধি পান। জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তারপর ফিরে আসেন দেশে। দেশে ফিরে তিনি বিজ্ঞান কলেজে অধ্যাপকের পদ পান। তাঁকে নিযুক্ত করা হয়, গুরু প্রসাদ সিং অধ্যাপক পদে। এবং এরপর ১৯৩৭ খ্রী. তিনি ঘোষ অধ্যাপক উন্নতি হন।

জ্ঞানেন্দ্রনাথের গবেষণার বিষয় ছিল কোলয়েড রসায়ন। বিশেষ করে কোলয়েডের তড়িৎ ধর্ম সম্বন্ধে গবেষণা করেন। ভারতে এ বিষয় নিয়ে গবেষণা এই প্রথম। ১৯২০ খ্রী. তিনি ফ্যারাডে সোসাইটি ও ফিজিক্যাল সোসাইটিতে যে মৌলিক প্রবন্ধ পাঠ করেন, তার জন্য তিনি বৈজ্ঞানিক-মণ্ডলীর ভূয়সী প্রশংসা পান। নোবেল পুরস্কার-প্রাপ্ত অধ্যাপক জিগমণ্ডী তাঁর কোলয়েডের তড়িৎধর্ম সম্বন্ধে প্রামাণিক গ্রন্থে ডঃ মুখোপাধ্যায়কে এই বিভাগের অন্যতম সংগঠক বলে বর্ণনা করেন।

একবার বর্মা অয়েল কোম্পানী জ্ঞানেন্দ্রনাথকে পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা পুরস্কার দেয়। কারণ তিনি কোম্পানির তেল নিষ্কাশন সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক সূত্রের সাহায্য দেন। কোম্পানি তাঁর সাহায্য পেয়ে উপকৃত হয়। জ্ঞানেন্দ্রনাথ সেই টাকা নিজে কিছুই নেন নি। সম্পূর্ণ টাকা তিনি বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করে দেন কোলয়েড গবেষণাগার প্রতিষ্ঠার জন্য।

তিনি বেশ কয়েকবার ভারতীয় বৈজ্ঞানিক মিশনের সদস্যরূপে কানডা, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে গিয়েছিলেন। জ্ঞানেন্দ্রনাথ ১৯৩৫ খ্রী. আন্তর্জাতিক সয়েল সায়েন্স অধিবেশনে ভারতীয় দলের নেতৃত্ব করেন এবং ১৯৫০ খ্রী. অধিবেশনে সহ-সভাপতি হয়ে যোগদান করেন। তিনি জার্মানীর কোলয়েড রসায়ন সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক ছিলেন। ১৯৫৩ খ্রী. তিনি ইম্পিরিয়াল এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর নিযুক্ত হন। ১৯৫০ খ্রী. তিনি বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউটের পরিচালক হয়ে রুড়কী যান। এরপর তিনি পার্থে অনুগত ক্যান ইণ্ডিয়ান ওসেন সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনের দ্বিতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ভারত সরকারের পাঠানো প্রতিনিধি দলের অন্যতম সদস্য ছিলেন তিনি। জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঐ বছরই লিওপোল্ডভিলে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সারবিজ্ঞান কংগ্রেসের সহ-সভাপতি মনোনীত হন। তিনি ভারত সরকারের দেওয়া সম্মানজনক উপাধি সি. বি. ই. পান ১৯৪৪ খ্রী.।



আত্মারাম

উত্তরপ্রদেশের পশ্চিমে পিলাসা একটা ছোট্ট গ্রাম। এই গ্রামে ১৯০৮ খ্রী. ১২ই অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন আত্মারাম। তাঁর ছোটবেলায় পড়াশোনা শুরু হয় গ্রামের স্কুলে। এখানে তিনি তিনটি ভাষা শিখেছিলেন—পার্সিয়ান, অ্যারাবিক এবং উর্দু। এরপর যখন আত্মারাম উঁচু ক্লাসে ওঠেন, তাঁকে বেশ কয়েক মাইল হেঁটে পাশের গ্রামে স্কুলে যেতে হত।

স্কুলের পড়া শেষ করে আত্মারাম বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা দেন। তারপর যান কানপুর এবং এম. এস. সি. ডিগ্রী পান রসায়নে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। তিনি বি. এস. সি. এবং এম. এস. সি. পরীক্ষায় প্রথম হয়েছিলেন।

পরীক্ষায় ভাল ফল করার জন্য, আত্মারাম গবেষণা করার সুযোগ পান। এই সময় তাঁর অধ্যাপক ছিলেন এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের এন. আর. ধর। সেই সময় এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক মেঘনাদ সাহাও ছিলেন। আত্মারামের অধ্যাপক সাহার সংস্পর্শে আসারও সুযোগ ঘটেছিল। এবং এ ব্যাপারে অধ্যাপক সাহাও তাঁকে সুযোগ দিয়েছিল যথেষ্ট।

একটা মজার ঘটনা জীবনের শেষদিন পর্যন্ত আত্মারামকে প্রায়ই স্মরণ করিয়ে দিত। ঘটনাটি ঘটে এক চিনির কারখানায় তিনি যখন ছুটির অবকাশে পরিদর্শন করতে গিয়েছিলেন। একজন টেকনিশিয়ানদের প্রধান [ইনচার্জ] তাঁকে হঠাৎ করেই প্রশ্ন করেন, "আচ্ছা বলতে পারেন ঠিক কোন্ অবস্থায় এই রসগুলো দানা বাঁধার পর্যায়ে পৌঁছবে?" কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর সেই টেকনিশিয়ানই আবার বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, আঙ্গুল দিয়ে রসের ঘনত্ব বুঝে কি করে তা বলা সম্ভব।

আত্মারাম এই ঘটনায় রীতিমত অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন। এবং উত্তর-জীবনে এই অভিজ্ঞতার কথা তিনি বার বার করে বলেছেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এবং তাঁর গবেষণায় সফলতা আনার জন্য টেকনিসিয়ানের ভূমিকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

মেঘনাদ সাহার প্রিয় পাত্র আত্মারাম ক্রমে ক্রমে পরিচিত হয়ে উঠতে থাকেন। এবং তাঁকে গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভারও দেওয়া হয়। আত্মারাম ন্যাশানাল প্ল্যানিং কমিটিরও কিছু কিছু কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলেন যার চেয়ারম্যান ছিলেন ভারতের প্রধান মন্ত্রী নেহেরু।

সেই সময় ভারত সরকারের তত্ত্বাবধানে জন্ম নেয়, সেণ্ট্রাল গ্লাস অ্যাণ্ড সিরামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট। এই প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব এসে পড়ে আত্মারামের উপর। আত্মারাম এই গুরুভার সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে সক্ষম হন। তিনি এই প্রতিষ্ঠানের জন্য কলকাতায় জমি কেনা থেকে শুরু করে এর পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা সবকিছু নিজেই করেন। ১৯৪৯ থেকে ১৯৫২ খ্রী. পর্যন্ত তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সংযুক্ত অধিকর্তা [জয়েন্ট ডাইরেক্টর] ছিলেন। এরপর তিনি হন অধিকর্তা।

এই সময় আত্মারামের জীবনে আর একটি ঘটনা ঘটে। তাঁকে জার্মানে যেতে হয়েছিল অ্যালাইড কণ্ট্রোল কমিশন টু ল্যাবরেটারিস অ্যাণ্ড ফ্যাক্টরিস্ এর আমন্ত্রণে। উদ্দেশ্য গ্লাস এবং সিরামিকস-এর বিষয় পরিদর্শন। এই পরিদর্শনের সময় হঠাৎ করেই এক দুর্ঘটনা ঘটে। চোখে আঘাত লাগে এবং একটি চোখ চিরদিনের জন্য অন্ধ হয়ে যায়। অনেক চেষ্টা করেও চোখটি ভাল করা যায় নি। তাঁর কলকাতায় দীর্ঘদিনের অবস্থানে তিনি হোমিওপ্যাথির ওপর আগ্রহান্বিত হন এবং ওষুধ ব্যবহার করার চেষ্টা করেন। আত্মারামের খাদ্য এবং জীবনধারণের প্রণালী ছিল অনাড়ম্বর। তিনি ছিলেন নিরামিষাষী। ধূমপান করতেন না।

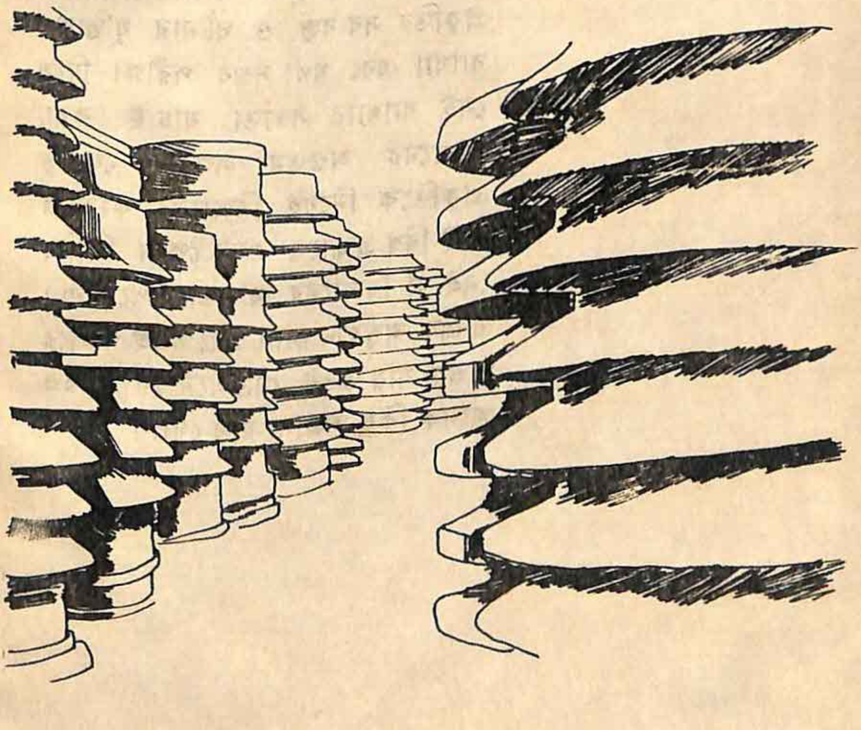
সেণ্ট্রাল গ্লাস অ্যাণ্ড সিরামিক রিসার্চের অধিকর্তা হিসেবে আত্মারাম এই সংস্থার বহু কিছু সংযোজন এবং পরিকল্পনা করেন। উত্তরজীবনে এই পদ্ধতি ভারতীয় গ্লাস ও সিরামিকের ক্ষেত্রে রীতিমত উল্লেখযোগ্য। তিনি বাতিল হওয়া মাইকা থেকে তৈরী করান মাইকার ইট, পেইন্টস। বাতিল হওয়া কাচ থেকে ফোম গ্লাস। যা কিনা ওজনে অত্যন্ত হাল্কা এবং তাপ নিরোধক।

আত্মারামের জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার—অপটিক্যাল গ্লাস তাঁর উৎপাদন এবং প্রক্রিয়া। এর জন্য দেশে ও বিদেশে সর্বত্র তাঁর প্রশংসা ছড়িয়ে পড়ে। তিনি দেশ এবং বিদেশের বহু কাচ শিল্পের কারখানা পরিদর্শন করেন।

১৯৫৯ খ্রী. আত্মারাম তাঁর বৈজ্ঞানিক কর্ম নিদর্শনের ওপর পুরস্কৃত হন শান্তিস্বরূপ ভাটনগর মেডেলে। কাচ শিল্পে তাঁর অবদানের জন্য পুরস্কৃত করেন গ্লাস ম্যানুফ্যাকচারার্স ফেডারেশন। ইন্টারন্যাশানাল কমিশন অফ গ্লাসের তিনি সদস্য ছিলেন। ১৯৬৬ খ্রী. তিনি শেফিল্ডের গ্লাস টেকনোলজির ফেলো নির্বাচিত হন। ভারতের সিরামিক সোসাইটি তাঁকে সম্মান দেখান তাঁর বৈজ্ঞানিক নৈপুণ্যতার জন্য ১৯৬৭ খ্রী.।

আত্মারাম ভারতের বৈজ্ঞানিক সংস্থার দুটি উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তাঁর এই সম্মান সর্বার্থক। ১৯৬৮ খ্রী. তিনি হন ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি। এবং ভারতের জাতীয় সায়েন্স অ্যাকাডেমির সভাপতি ১৯৬৯-'৭০ খ্রী. এর জন্য।

এই প্রথিতযশা বিজ্ঞানী ১৯৮৩ খ্রী. শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।



বিজ্ঞান বিশেষ ভাবে অর্জন করা জ্ঞান। এই জ্ঞান অর্জনের পদ্ধতির মধ্যেই লুকিয়ে আছে এর বিশেষত্ব। এর প্রত্যেকটি ধাপ যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রকৃতির সব বস্তু ও ঘটনার যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা এবং যথা সম্ভব পরীক্ষা দিয়ে সেই ব্যাখ্যার সত্যতা যাচাই করা, বিজ্ঞানের অন্যতম লক্ষ্য। যেহেতু প্রকৃতিকে নিয়েই বিজ্ঞানের কারবার তাই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে এমন কোন জিনিষ নেই যা বিজ্ঞানের আওতায় পড়ে না। এ এক অন্তহীন জ্ঞান এবং যতই গভীরে যাওয়া যায় ততই যেন মনে হয় আরও অনেক কিছু অজানা রয়ে গেল।